সংখ্যালঘু

কিন্নর রায়

অক্ষর ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী

শ্রদ্ধাভাজনেষু

কাঠের সিন্দুকের পেছনে যে আড়ালটুকু, সেখানে অনেকটা অন্ধকার। মাকড়সার জাল। ক্লাস থ্রি-র ইউসুফ আলি সর্দারের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়ানো সিন্দুক। তার গায়ে চৌকো চৌকো বড় ডিজাইন। পায়ার নিচে চাকা। এ-ঘর ও-ঘর করতে গেলে ঠেলে ঠেলে—গড়গড়। গড়গড়।

এখন মাটির মেঝের ভেতর কাঠের চাকা অনেকটা বসে গেছে। সরাতে গেলে মেঝে খুঁড়তে হবে। ডালা খোলার পেতলের কবজা, কোণে কোণে পেতল বাঁধানো কারুকাজ ধুলোয়-ময়লায় ম্যাড়ম্যাড়ে। কবে যে তার জেল্লা ছিল, বোঝাই যায় না।

আমি জানি এ সিন্দুকের ভেতর আরও একটা কাঠের বাক্স আছে। চোর-কুঠুরি, জিনিস রাখার খোপ। তার ভেতর ভারি ভারি পেতল-কাঁসার দু-একখানা বাসন। জার্মান সিলভারের থালা-গ্লাস। কুল্লি করে পানি ফেলার চিলমচি। আমার আব্বার আব্বা—দাদা গওহর আলি সর্দার খুব শখদার মানুষ। নিউ মার্কেট থেকে জার্মান সিলভারের ছটা চামচ, ছটা কাঁটা এনে রেখেছে, তাও এই সিন্দুকে। ওসব বের হয় বাড়িতে মেহমান এলে। নয়তো রোজার ঈদ, তারপর কুরবানির ঈদ—মাংস-পরোটা-সিমাই-লাছছা। বাড়িতে মেহমান আসবে। বসবে। খাবে। তার খাতিরদারি করতে হবে।

এ সিন্দুকের কোনো একটা কোণে লাল রঙের হাত দুয়েক লম্বা একটা বাক্স আছে। তার পেটের ভেতর হরেক কিসিমের বাহারি টুপি। তার রঙই বা কতরকম—লাল, শাদা, সবুজ, কালো। কোনোটায় জরি বসানো, কোনোটায় চিকনের কাজ। দাদা গওহর আলি সর্দারের টুপির খুব শখ। ইসলামি জলসা, কাওয়ালিতে যেতে গেলে, নয়ত ঈদের দিনে নামাজের পর মিলবার সময় তাঁর মাথায় রকম রকম টুপি। শানসওকত দেখে সবাই তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

এচুপ, ও এচুপ—ইস্কুলি যাবি না বাপ!

মা—ফোর্ণিবিবির গলা শুনে ইউসুফ দম বন্ধ করে নিজের পেটটাকে আরও আরও চ্যাপটা করতে চাইছিল। উত্তেজনায় বুক বুঝি ভাঙে। পায়ের ওপর

দিয়ে হেঁটে যাওয়া আরশোলা। হাঁটুতে, প্যান্টের পেছনে জড়িয়ে যাচ্ছে মাকড়সার জাল। তবু আড়ালে, নিজেকে একেবারে লুকিয়ে রাখতে চাইছে ইউসুফ।

বাইরে কাঁঠালের ভারি, সবুজ পাতার ওপর বৈশাখের গরম রোদ। সেখানে গোটা দুই ডানা নাড়ানো কালো ভেলভেট রঙের প্রজাপতি। একটা বেনে-বৌ পাখি তার হলুদ ডানা ঝাপটে বুঝিবা আরও কোনো সবুজে উড়ে গেল। একপাশে ফলসার সবুজ সবুজ পাতার গা ঘেঁষে বাসন্তী রঙের ফুল। তার ওপর মধু তুলতে আসা উড়ে বেড়ানো মৌমাছি। এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ইউসুফ। তবু এই গরমে ভারি সিন্দুকের পেছনে একলা ঘেমে উঠে, আরশোলার ছোঁয়ায় সামান্য চমকে উঠতে উঠতে তার মনে হচ্ছিল, আর একটু সময় পার করে দিতে পারলেই আজ আর স্কুলে যেতে হবে না।

ও বাপ এচুপ, এচুপরে—কোতা নুকুলি বাপ।

ফেণিবিবির গলা অনেকটা কাছে। নিজেকে মাটির দেয়ালের সঙ্গে আরও সেঁটে রাখল ইউসুফ। তার চোখের সামনে তখন বোড়ালে ঋষি রাজনারায়ণ বসু স্কুলে যাওয়ার রাস্তা। কাঁচা রাস্তায় এখন অনেক ধুলো। খেলার সেই ধুলো ঢিবি করে একবার লেতকে দিলেই হাওয়া, সারা গা-মুখ ধুলোয় ধুলোময়। খেলাটাকে আমরা বলি বোম ফাটানো। পথের দুপাশে লম্বা লম্বা গাছ। বাগান। তার মাথায় দল দল ল্যাজঝোলা কালোমুখ হনুমান। এ গাছ থেকে ও গাছে হুপ হুপ ডাক ডেকে। গোদাদের কারও কারও বুক আঁকড়ে কচি বাচ্চা।

সরল দিঘিতে পদ্ম ফুটেছে। তার চিকন সবুজ বড় বড় পাতা। পাতার আড়ালে মিশকালো জল। দূরে থেকে দেখলে শির শির করে ওঠে পায়ের নিচে অব্দি।

একটু দূরে ঝাড়ালো নিম গাছের ডালে বসা মাছরাঙা, কোচবক, শাদা বক। ভাঙা ঘাটের ওপর সেই নিমের ছায়া। চৈত্রে হলুদ হলুদ নিম ফলে সমস্ত ঘাট ঢেকে গেলে, পায়ে পায়ে থ্যাঁতলানো নিম ফলের ভেতর লাল লাল বিষ পিঁপড়ে, সার বেঁধে। জলে মাছরাঙা ছোঁ দিলে সাত রঙ খেলা করে দিঘির আয়নায়।

আজ আমি কিচুতি ইস্কুলি যাবে না। এমন ভাবনার ভেতর দম আটকে দাঁড়িয়ে ইউসুফ। মাটির দেয়ালের একটা ধুলোটে গন্ধ তার নাকের ভেতর দিয়ে মাথায় পৌঁছে সুড়সুড়ি দেয়।

ও বাবা এচুপ—ফেণিবিবির গলায় আকুতি আটকে থাকে। তারপর স্বাভাবিক রাগে···না ঝাবি, না ঝাবি—ভারি ঘোড়ার কচু আমার ···বলতে বলতে মা এঘর থেকে দরজার দিকে সরে যায়—ইউসুফ মরীয়া হয়ে নিজেকে সরু করে সিন্দুকের পেছন থেকে টেনে বের করে এনে এদিক এদিক তাকিয়ে টেনে এক ছুট।

মাটির উঁচু দাওয়ায় দড়ির দোলায় বড়বুবু জুবেদা ছোট ভাই ইদ্রিসকে দোল দিতে দিতে কি যেন গান শোনাচ্ছে। আর মণিটা মাঝে মাঝেই কেঁদে উঠছে। উঠোনে গোরুর গোইল। ছাগল রাখাব ঘর। হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়।

ইউসুফের পায়ের নিচে মুক্তি মুক্তি। আজ আর শচীন মাস্টার পড়া না পারলে দু ঘা বেত বেত মেরে বলবে না—মোল্লার ছেলে আর কত বুদ্ধি হবে!

নয়তো হাতের চেটোয় ডাস্টারের বাড়ি। দু-আঙুলের ফাঁকে পেনসিল ঢুকিয়ে চাপ।—মোল্লার ছাওয়াল, মোটা বুদ্ধি। গোস খাবি। খালি গোস খাবি ·আর কি হবে!

দূরে ঝিলের বুকের ওপর রোদমাখা আস্ত আকাশ উপুড় হয়ে আছে। পাশে গোটা চারেক তালগাছ। তার নিচে তিনটে মোষ। এখান থেকে দেখলে সব মিলিয়ে আস্ত একটা ছবি। মোষগুলো আয়নালদের। আমাদের বাড়ি ছাড়ালেই ওদের দলিজ। তার পেছনে গোইল—গোয়ালঘর।

ঘামে রোদে ঘামাচিতে সারা শরীর চিটপিট। চিটপিট।

ইউসুফ তেমন করে সারা গা চুলকোতেও পারল না। ঐ ঝিলের পাড়ে রবে মুচি আর মায়া মুচি থাকে। আর তাদের দু-ভাইয়ের দুটো বো। রবে মুচির মেয়ে পৌষি। মায়া মুচির ছেলেপুলে নি।

ইউসুফ ছুট লাগাল। ছুট ছুট। ছুটতে ছুটতে নোনা ঘাম ফুটে উঠছিল ইউসুফের গায়ে। মাথার ওপর গ্রীষ্ম দিনের আকাশ। সেখানে রোদের খেলা। তারপর সামান্য হাঁপিয়ে পৌষিদের ঘরের সামনে পেঁছৈ, ও পৌষি, পৌষি—খেলবি না—এমন ডাক দিতেই বছর সাতের পৌষি দরজার সামনে ফুটে উঠল। পৌষির লালচে রুখু চুলে সকালের রোদ আটকে আছে: নোলকপরা নাক, শ্যামলা গোল মুখ, ছোট ছোট দু-চোখ হাসিতে চিকচিক করে উঠল। তোর সামনে এসে দাঁড়ালেই খেলার আনন্দ। আমি আজ ইস্কুলি যাইনি পৌষি। শচীন মাস্টার পড়া না পারলি বড্ড মারে। বকুনি দেয়। তার চেয়ে বরং তোর সঙ্গে খেলা করি। কি খেলা? রান্নাবাড়ি।

বর-বৌ। ধুলোর ভাত, পাতার লুচি, কাদার তরকারি। রবে মুচির মেয়ে পৌষি আমায় যত্ন করে খেতে দেবে। পাখার বাতাস দেবে। কি ভালো লাগবে।

পৌষি দরজায় দাঁড়িয়ে। দূরে দিঘির জলে পর পর কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তার ধাক্কায় রোদমাখা জল লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে। একটা দুটো তিনটে চিল ছুরি হয়ে চক্কর দিচ্ছে আকাশে। আরও উঁচুতে কি? ইউসুফ বুঝতে পারছিল না।

পৌষি কোনো কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে ইউসুফকে খেলতে ডাকল।

রবে মায়া দুভাই ঢাক-ঢোল বাজায় পুজোবাড়ি। এ বাড়ির বাতাসে কেমন একটা শুকনো চামড়ার গন্ধ মিশে থাকে। এমনি সময় হলে যে কোনো মানুষের গা উল্টে বমি আসবে। ইউসুফ সেই চামসানি গন্ধকে তেমন করে গায়ে মাখল না।

দুই

মাথায় ঝাঁকা চাপিয়ে হাঁসের বাচ্চা বিক্রি করতে এসেছে নুর আলি ঘরামি। খালি গায়ের কালো চামড়ায় ঘামের নুন ফুটে আছে। অনেকটা লম্বা মানুষ। মাথা বোঝাই কাঁচা চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। চিবুকে দু-এক গাছা দাড়ি। গোঁফ তেমন ঘন নয়।

বুড়িয়ার দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে এই ব্রহ্মপুর বাদামতলায়।

ফেণিবিবি হাঁস পোষে। তার শাশুড়ি জোবেদান বিবি, ছোট জা মরিয়মবিবি, বড় জা আয়েষাবিবি—সকলেই। হাঁস ব্যাপারি নুরু আলি আর তার ভাই সুলেমান। সুলেমানের কাঁধে বাঁশের বাঁকের দুপাশে ছোট ছোট বাঁশের খাঁচা—ঝুলিয়ে রাখা। তার ভেতর হাঁসের বাচ্চা।

জোবেদান বিবি দর করছিল।—ও বাবা নুরু, গতবার অনেকগুলো হাঁসা—খুব ক্ষেতি হয়ে গেল বাপ—জোবেদান তাদের লোকসান বোঝাতে চাইছিল।

অত তো ডাক দেখে নিলেন। হাঁসার গলা ফাঁসফাঁসে। হাঁসির ডাক অন্যরকম—পিকপিক। পিকপিক, আপনারাই তো বলছিলেন। নুর আলি এরকমই কি একটা বলতে বলতে কাঁঠাল গাছের ছায়ার নিচে বসে বিড়ি ধরিয়ে

নিচ্ছিল। খাঁচা, ঝুড়ির ভেতর থেকে হাঁসেদের কাঁচ গলা ধীরে মিশছিল বাতাসে। পেচ্ছাপ করার মতো একটা জায়গা খুঁজছিল সুলেমান।

কি জানি বাপু, হাঁস হাঁসা এখন আর চিনতি পারি না! তোমরা সব কি কমনে কেটেকুটে নিয়ে আস।

জোবেদানবিবির গম্ভীর কথাতেও তার ছেলের বৌ-রা হাসি চাপতে মুখে আঁচল ঢাকা দিল।

দরাদরি করতে করতে শেষ পর্যন্ত ছটি হাঁসের বাচ্চা জোবেদানবিবির হাতে তুলে দিতে পারল নূর আলি। শাদা, ছাই ছাই, কালোয়-শাদায়। শাদা হাঁসের হলুদ ঠোঁট।

মাথার ওপর চাঁদি ফাটা রোদ্দুর। এখনও কতটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। সুলেমান ততক্ষণে পেচ্ছাপ করে ফিরে এসে পুকুরের পানিতে হাত ধুয়ে নিয়েছে। জোবেদান তার হাঁসের বাচ্চাদের গুছিয়ে তুলে নিচ্ছিল।

নতুন নতুন কদিন পুকুর ঘাটে পায়ে দড়ি বেঁধে রাখতে হবে। এমন ভাবনার ভেতরই জোবেদান দেখতে পেল ইউসুফ কাঁঠাল গাছের পেছন দিকে দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে। বেলা দশটাও হয়নি এখনও, কি রোদ কি রোদ! মাথার ওপর হাঁসের বাচ্চা বোঝাই ঝুড়ি চাগিয়ে তুলতে তুলতে নিজের মনেই বলে ফেলল নূর আলি। তার হাঁসের খাঁচার ছায়াছবি আটকে যাচ্ছিল মাটিতে। আধ ঘণ্টা আগে সাইকেলে যাওয়া হাতে ঘড়ি বাঁধা এক বাবুকে টাইম জিগ্যেস করলে মুখ কোঁচকানো জবাব পাওয়া গেছিল— সাড়ে ন'টা। তার সঙ্গে এই সময়টুকু যোগ-বিয়োগ করে নূরু আলি ধরে নিচ্ছিল দশটা বাজে। আর তখনই কেরোসিনের টিন মাথায় কেরোসিনঅলা মানুষটি এসে দাঁড়াল জোবেদানের সামনে।

উঠোনে নতুন বাচ্চা দেয়া মুরগি-মা পোকা খুঁজছিল। আর একটু এগিয়ে আয়নাল জয়নালদের দলিজের পাশ থেকে ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। বড় ঝুড়ির নিচে মুরগির পাঁচটা বাচ্চা আছে। কাকে বড্ড ঠোকরায়। চিলে ছোঁ মারে। বেড়াল আছে। নিজের মনে বকবক করছিল জোবেদান। এর মধ্যে আবার কেরোসিন তেল তোলা—কোথা দিয়ে সামলাব আমি। সারা দিনে এত কাজ। এত কাজ, বাসরে বাস!

নিজের ভেতর নিজেই গজগজ করছিল জোবেদান। আমার স্বামীর তিরিশ বিঘে জমি। ছটা গাই গোরু। হেলে বলদ চারটে। জোবেদান

হিসেব করছিল। নূর আলি তার সুলেমান ততক্ষণে হাঁসের ঝুড়ি আর খাঁচা বাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে কাঁচা রাস্তার বাঁকে ধীরে মুছে যাচ্ছিল।

উঠোনে ধানের গোলার গায়ে চুনের দাগ দিয়ে দিয়ে কেরোসিন তেলের হিসেব রাখা আছে। সালসার পুরনো, মোটা কাচের বোতল এনে রাখল ফেণিবিবি। অনেকটা দূরে।

এ সালসা কবে যেন এসেছিল বাড়িতে। সে কি ফেণিবিবি মা হওয়ার পর, নাকি তারও অনেক আগে—জোবেদানের কোলে যখন তার ছেলেমেয়েরা—সে সব আজ আর মনে নেই কারও।

জোবেদান মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে, ভালো করে গা ঢেকে তা এগিয়ে দেবে কেরোসিন তেলঅলার দিকে। এ হিন্দুস্থানী ছেলেটার বয়েস কত! বাড়ি বাড়ি তেল ফিরি করতে করতে ভালো বাংলা শিখে গেছে। টিনের পাঁট মেপে তেল দেয়। সুযোগ পেলেই মাপে মারে। অভ্যেস। বললে হাসবে।

ওর টিনের গভীরে, জল রঙ কেরোসিনের নিচে অনেকগুলো ঝকঝকে খুচরো পয়সা। সিকি, আধুলি, দশ নয়া, পাঁচনয়া, দু নয়া। তামার এক নয়া পয়সা। হাসতে হাসতে ফানেলে তেল ঢালছিল ছেলেটি। বাতাসে কেরোসিনের গন্ধ মিশে যাচ্ছিল।

বোতলে তেল মেপে নিয়ে ধানের গোলার গায়ে আরও একটা চুনের দাগ দিল জোবেদান। আজ পয়সা দেবে না। দাগ গুনে মাস গেলে হিসেব।

তেলঅলা হিন্দুস্থানী ছোকরা হাসলে তার সোনার ফুটকি দেয়া ওপর পাটির সামনের দুটো দাঁত জ্বলজ্বল করে ওঠে। জোবেদান মনে মনে বলে ওঠে—চবু—ঢং। মাথায় গামছার বিড়ে পাকিয়ে তার ওপর টিন তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে ছেলেটি। গলা দিয়ে কি এক বিচিত্র সুর বার করে নেয়। সবাই বুঝতে পারে কেরসিন তেলঅলা এসেছে।

কাঁঠাল গাছের আড়ালে নিজেকে একটু ঢেকে দাঁড়িয়েছিল ইউসুফ।

ও এচুপ, গোরুটাকে একটু নেড়ে দে না। নেড়ে দে বাপ।

আমি ইস্কুলি ঝাব না! বলতে বলতে ইউসুফ খানিকটা পিছিয়ে যায়।

ও মণি, শোন। গোরুটাবে নেড়ে দে বাপ।

আমি ইস্কুলি ঝাব—ইউসুফ পিছু হটছিল। আর একটু দূরে দলিজের ছায়ায় দাঁড়ানো মোতালেব, আয়নাল আলি মণ্ডলের বড় ছেলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

আয়নাল আলি মণ্ডলদের দলিজ ঘরের কপালে এখনও শ্বেতপাথরের ওপর কালো অক্ষরে ৭৮৬। তার পরের লাইনে আশরাফ ভবন—এই কথাটি বাংলায় স্পষ্ট করে লেখা। রোদে-জলে কালো অক্ষর কিছু ফ্যাকাশে। তবু জয়নাল, আয়নালের আব্বা আশরাফ আলি মণ্ডল তার নামটি নিয়ে এখনও দলিজের কপালে স্মৃতি হয়ে জেগে।

দলিজের গা ফাটিয়ে অশথ জেগেছে। বটের চারা। তাদের গায়ে রোদ, ধুলো। এই সব গাছের শেকড় যেনবা কোনো প্রেতের আঙুল হয়ে জড়িয়েছে। পাতলা চ্যাপটা ইটের সুরকির গাঁথনি। তিরিশ ইঞ্চি মজবুত দেয়াল। তার ফিতে হয়ে পড়ে থাকা ছায়ায় মোতালেব ইউসুফকে বলছিল, খাসি খেলবি ?

ইউসুফ ঘাড় নাড়ল। নাহ।

বৌ-বসন্তি, ফুটুলমালা ? মোতালেব জানতে চাইছিল।

ইউসুফ বুঝতে পারছিল মোতালেবও আজ স্কুলে যাবে না। এখন দল জুটিয়ে দিঘির পাড়ে বড় মাঠে সবাই মিলে অনেকক্ষণ হইচই। ইউসুফের ভালো লাগছিল না। দলিজের দেয়াল আঁকড়ে থাকা আশুথ গাছের পাতায় গ্রীষ্ম দিনের বাতাস দোলে দিয়ে যাচ্ছিল। তার নরম নরম ছায়া নড়াচড়া করছিল দেয়ালের গায়ে। কালো পিঁপড়ের সারি ডিম মুখে নিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে রওনা দিচ্ছিল কোনো অন্য ঠিকানায়। বয়স্ক মানুষেরা দেখলে বলতেন, তাহলে এবার পানি হবে।

দূরে মসজিদের গায়ে, কবরখানার পাশে আশফলের ঘন সবুজ ছায়ায় দুটি ঘুঘু নিজেদের মনে ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের ছাই রঙ অনেকটাই মিশে গেছে ছটাকি আশফলের সবুজ ছায়ার সঙ্গে। পাশে নেউড় গাছে অনেক, অনেক নেউড়। অনেকটা আমলকি চেহারার, শাদা রঙের—ছোট। গায়ে খাঁজ আছে। পাতার থেকে ফল বেশি। থোকা ধরে আছে। সেই যে গেল বছর খুব আম হলো। গাছে গাছে অনেক আম। চিনের খাস, জামসিন আমের গাছে যত পাতা, তত ফল। দাদি বলছিল, এবার এত আম, যেন নেউড় ফলেছে ! একটা ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়লে এক থোকা নেউড় পড়ে। মুখে দিলে টক স্বাদ। ইউসুফ একটা ঢিল খুঁজছিল।

এই নে—মোতালেব এতটা মাটির ঢেলা এগিয়ে দিল।

ঢেলা হাতে, দাদির চোখ বাঁচিয়ে ইউসুফ মাটির রাস্তার এপারে। বেলা বাড়লে একটু হাওয়া দিলে কাঁচা রাস্তায় ধুলো ওড়ে, আশফল গাছের ছায়ায়

ঘুরে বেড়ানো জোড়া ঘুঘুর একটা পায়ের শব্দ পেয়ে উড়ে গেল। পেছন পেছন ডানা ভাসাল আর একটা। আশফল গাছের পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস খেলে যাচ্ছিল। এর পেছনেই কবরখানা! ইউসুফ আর এগোতে পারল না। মোতালেবও না।

বিকেলে গরম একটু কমে আসে। আর আলো মরে এলে বন-চড়ুইরা মসজিদের সামনে হঠাৎ হঠাৎ ধুলিস্নান সেরে নেয়। তারপর ঝাঁক বেঁধে একটি উড়ন্ত মালা হয়ে উড়তে উড়তে, দুলতে দুলতে বড় ঝাড়ালো কোনো গাছের ডালে গিয়ে বসতে চায়। বাদাম গাছে এখন নবীন পাতা। তার ডালে, মগডালের কাছে কোটরের ভেতর এক জোড়া শাদা প্যাঁচা রোজ এসে বসে। দিনের আলোয় তাদের দেখা যায় না। কাকের ঠোকর খাওয়ার ভয় থাকে।

এই প্রথম গরমে সজনে গাছের ডালে ডালে শুঁয়োপোকা এসেছিল। তাদের ধরে ঠুকরে খাওয়ার জন্যে পেছন পেছন ছাতারে পাখির ঝাঁক। ধুলো রঙের, খুব ঝগড়া করা এইসব পাখি দল বেঁধে উড়ে যায় সন্ধ্যা নামার আগেই। এই শেষ বিকেলে দলিজের পেছনে নিম গাছের পাশে সজনের দুটি পুরুষ্টু গোড়ায় একদল ছাতারে শুঁয়োপোকা খোঁজায় ব্যস্ত ছিল। আর দলিজের ভেতর শেষ বিকেলের আলোয় একা একা চুপ করে বসেছিল ইউসুফ।

মোতালেব একটু দূরে।

মোতালেবের ঠাকুরদা—আশরাফ আলি মণ্ডলের তৈরি এই দলিজের ভেতর শেষ সূর্যের আলো লেগেছিল। দেয়ালে কুলুঙ্গি। তার মাথায় ফুলের ডিজাইন। ছাদে চুন-সুরকির গাঁথনিতে ফুল। তার ওপর বেশি নীল দিয়ে চুনকাম করা। মেঝের বারোটা বেজেছে অনেক দিন। সিমেন্ট উঠে খোবলা হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। ফুলে ওঠা সিমেন্ট, পা দিয়ে, নয়ত হাতের আঙুলে টোকা দিলে ঢবঢব, ঢবঢব শব্দ উঠে আসে। এখানে ওখানে আরশোলা। কাঠপিঁপড়ে। এক পাশে নিঃসঙ্গ পায়া ভাঙা, বাতিল চৌকির ওপর হেমন্তের খড় রাখা থাকে টাল দিয়ে। বর্ষায় ফাটা ছাদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পানি নামে, চৌকির ওপর। এভাবেই দিন যায়।

মোতালেবদের দলিজে একা একা, কখনও মোতালেবকে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে ভালো লাগে ইউসুফের। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ঘরের ছাদ থেকে বড় বড় ঝুল নেমে এসেছে দেয়ালে, এখানে সেখানে মাকড়সার

জাল। কুলুঙ্গিতে কোথাও কোথাও আলো জ্বালার কালির দাগ। কেরোসিনের শিস উঠেছিল। তার চিহ্ন রহে গেছে। আর তখনই ইউসুফ কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার গায়ে বিদায়ী সূর্যের প্রবল রক্তারক্তি দেখতে দেখতে হঠাৎ পায়ের কাছে এক টুকরো ছোট সরু ডাল পড়তেই—শব্দে চমকে উঠে সেই ডালটি কুড়িয়ে নাকে ধরে ঘুঘুপাখির গন্ধ · শুধু এটুকুই বলে ওঠে।

তার কথায় চটকা ভেঙে মোতালেব কি ব্যাপার জানতে কাছে আসতেই তাদের মাথার ওপর দিয়ে কি একটা পাখি ডানা ঝাপটে মোতালেবদের গোয়ালের দিকে চলে যায়।

ঐ যে ঐ যে ঘুঘুপাখি, ইউসুফ চিৎকার করে ওঠে। পাখিটি ততক্ষণে বাতাস সাঁতরে কোথায় যেন চলে গেছে। তাকে আর দেখা যায় না। শুধু তার গন্ধটুকু ইউসুফের স্বপ্ন হয়ে সেই সরু ডালের গায়ে লেগে থাকে। ইউসুফ ডালটিতে হাত বোলায়।

তিন

বড়বুবু জুবেদার গলা খুব মিষ্টি। সারাদিন কাজ করে আর খুব নীচু গলায় মাঝে মাঝে গান গায়। দাদি গানের সুর শুনতে পেলে বকবে। মুখ বেঁকিয়ে বলবে, চব্ব। দাদা শুনলে বকবে। আব্বা শুনলে গালাগালি দেবে। তবু জুবেদাবুবু গান গাইবে।

এবার খুব কাঁঠাল ফলেছে। ঘরে টাল দিয়ে রাখা কাঁঠাল পেকে উঠলে তার গন্ধ বাতাসকে মাত করে রাখে। মাটির উঁচু দাওয়ায় বসে জুবেদাবুবু ছোটভাই ইদ্রিসকে দড়ির দোলায় দোলাতে দোলাতে খুব আস্তে আস্তে গান গাইছিল। গানের সুরে কথায়—'ঢাকাই শাড়ি, ঢাকাই শাড়ি'—বারে বারে কানে বাজছিল ইউসুফের। বাকি আর সব কথা তেমন করে বোঝা যাচ্ছিল না।

এ গান মা-ও গায় মাঝে মাঝে দুপুরে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে। মা তখন লম্বা ঘন চুলের গোছ বাতাসে ছেড়ে দিয়ে শুকিয়ে নিতে চায়। মায়ের গলায় কি যেন একটা সুর, অনেকটা যেন চাপা কান্না। শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা মুচড়ে চোখে জল এসে যায় ইউসুফের। ছোটবুবু নাসিমা,

বড়দা ইউনুস—খুব ঠাট্টা করে। খ্যাপায়। ইউসুফের কিছু করার থাকে না।

এ বাড়ির পেছনে, পাশে গোটা চারেক সার গাদা। যত জঞ্জালের আড়ত। সেখান থেকে পচা গন্ধ উঠে আসছিল! হাওয়া দিলে গন্ধটা আরও গুলিয়ে ওঠে। মা গোইলের কাজ করছিল। গোরুদের নাড়াঘাঁটা।

দাদি জোবেদানবিবি দু হাতে সর্ষের তেল মেখে, পা মুড়ে কাঁঠাল ভাঙতে বসল। সোনালি হলুদ রঙের বড় বড় এক একটা রসখাজা কোয়া। ভেতরের ভুতি বাদ দিয়ে গালে দিলেই কি রস! কি রস! গোটা মুখ ভরে যায়। কাঁঠালের গন্ধে সঙ্গে সঙ্গে ভনভনে নীল মাছি।

দাদি এক হাত দিয়ে বড় বড় মাছি তাড়াতে তাড়াতে অন্য হাতে কাঁঠালের কোয়া খুলছিল। তার কালো চামড়া বেয়ে কাঁঠালের হলদেটে রস নেমে অসেছিল কনুইয়ের কাছাকাছি। সেখানেও একটা বড় নীল মাছি।

মুখের ভেতর দাঁতে কাঁঠালের রসাল কোয়া ভাঙতে ভাঙতে এসব দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ। তার দাঁতে কাঁঠালের আঠা খানিকটা খানিকটা জড়িয়ে যাচ্ছিল। পাশে বড়বুবু জুবেদা, ছোটবুবু নাসিমা—এই দুই দিদিরই কাঁঠালে খুব উৎসাহ।

বড়দা ইউনুসও খাচ্ছিল।

কোয়ার ভেতর থেকে বীজ বের করে করে গুছিয়ে রাখছিল জোবেদান। পানিতে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে রোদে শুকিয়ে ভাতে দিয়ে খাওয়া যাবে। উনোনে পোড়া দিয়ে খেতে দারুণ সোয়াদ। ভালো তরকারি হয়। বাচ্চারা খেতে পারে!

দেখতে দেখতে একটা বড় কাঁঠাল খোসা আর ভুতি সার হয়ে গেল। কাঁঠালের কাঁটাঅলা খোলার গায়ে তখনও মাছির ভনভন। ওড়াউড়ি।

মাটির মেঝেয় কাঁঠালের রস টুপিয়ে টুপিয়ে পড়েছিল, একটা দুটো করে পিঁপড়ে সার বেঁধে থেমে গেছিল সেখানে। এটা গোরুর ডাবায় দিয়ে আয়—বলতে বলতে কাঁঠালের খোসাটাকে পাকিয়ে জুবেদার হাতে ধরিয়ে দিল জোবেদান। দাদির কালো হাতে বাঁকা বাঁকা ডিজাইনের দুগোছা করে বাতনা—দস্তার চুড়ি। আর কয়েকটা রঙিন কাচের। ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল। দাদির এই হাত নাড়ানোয় চুড়ি বেজে উঠল, ঠুনঠুন।

ফেণিবিবি গোইলের কাজ সেরে কলাগাছের শুকনো এঁটে, বাসনা বেগুন পালায় জ্বালিয়ে ছাই করছিল। তা দিয়ে ক্ষার তৈরি হবে। ক্ষারে কাপড়

কাঁচা, কখনও গা-মাজা। রোদ লাগা উঠোনে কলার শুকনো খোলা পোড়ানোর গন্ধ ভাসছিল। ধোঁয়া উঠছিল পাক দিয়ে। এসবই দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ। তার দাঁতের ফাঁকে তখনও কাঁঠালের কোয়ার আঁশ।

বাড়ি থেকে এক পা দু পা করে বেরিয়ে এলে জামসিন আমের গাছ। যেমন বড় বড় আম, তেমনই মিষ্টি। আর একটু এগিয়ে মাটির চওড়া রাস্তার মুখে এসে ডান দিকে তাকালেই সেই বিশাল, ঝাড়ালো বাদাম গাছ। তার উল্টো দিকে চিনেখাস আমের গাছ। কি স্বাদ আমের। একটুও চোঁচ নেই। মিষ্টি যেন গুড়। গাছটির নিচে একটি ছায়ালো অন্ধকার আছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইউসুফ শুনতে পেল—ও মণি, গোরু দুটো একটু নেড়ে দে। দাদির গলা। কাঁঠাল খাইয়েছে এতক্ষণ যত্ন করে। মাঠে যেতেই হবে। পেট ভরে ঘাস খাওয়াতে হবে গোরুকে। রেনিয়ায়, বাদার দিকে ঘাস আছে। সবুজ সবুজ কচি দুব্বো। দাঁতে টেনে ছিঁড়ে খেতে খেতে গোরু পেট ভরাতে পারবে।

পায়ে ফিতেঅলা খড়ম ছিল। এখানে ওখানে, স্কুলে যাওয়ার সময় ফিতেঅলা কাঠের খড়ম পায়ে থাকে। রেনিয়ার বাদায় যাওয়ার আগে খড়ম খুলে রেখে এলো ইউসুফ। হাঁটু অব্দি নেমে আসা হাফপ্যান্ট। খালি গা। হাতে বাঁশের সরু কঞ্চি আর গোরুর দড়ি। কাঁধে গামছা। আর তখনই বাশার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন দেখা হয় না বুড়িকে। বোড়াল যাওয়ার মেঠো রাস্তার পাশে মাটির নিচু ঘরের ভেতর বাশার মা। তার জন্যে দু-পকেটে খানিকটা চাল-কড়াই ভাজা নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল ইউসুফ। গোরু নেড়ে দিতে যাচ্ছে। দাদির কাছে এখন চাল-কড়াই ভাজা ভাজা চাইলে পাওয়া যাবে। এমন ভাবনার ভেতরই জোবেদানবিবির কাছে চাল-কড়াই ভাজা চেয়ে নিতে পারল ইউসুফ।

নাতি আমার গোরু নেড়ে দিতে যাচ্ছে। মণিটা কি ভালো—এরকম নানা কথা নিজের মধ্যে ভাবতে ভাবতে জোবেদান বড় বড় থাবায় মুঠো করে চাল-কড়াই ভাজা এনে ইউসুফের দু-পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

ধুলোয় ধুলো রাস্তা। পানি পড়লেই এ রাস্তা কাদায় কাদা। একেবারে এক হাঁটু। কাদা ভাঙতে ভাঙতে পায়ে হাজা। তখন একবার ঘরে ঢুকে গেলে আর বেরতে ইচ্ছে করবে না। গোরু দুটোর খোঁটাসুদ্ধু দড়ি দু-হাতে। ইউসুফ ধীরে হাঁটছিল।

আর তখনই তালগাছের পাশ থেকে—এচুপ, এচুপ্ রে—শুনে চমকে পেছনে তাকিয়ে ইউসুফ দেখতে পেল দিঘির পাড়ে দাঁড়ানো পৌষি। এখান থেকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে সোজা তাকালে কয়েকটা তালগাছ, দিঘি আর পৌষি, এ ছাড়া কেউ কোথাও নেই। পৌষি হাত নেড়ে আরও কত কি বলছে।

ইউসুফের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল দড়ি ছেড়ে দিয়ে গোরু দুটোকে যেখানে খুশি যেতে দিয়ে পৌষির হাতছানিতে চলে যায়। পৌষি তখনও এতটুকুন হয়ে দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে। ইউসুফ হাত নাড়ল। তারপর পেছন দিকে আর না তাকিয়ে হাঁটা দিল সামনের দিকে।

এই জঙ্গলের ভেতর বাশার মা বুড়ি কেমন করে থাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না ইউসুফ। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে ওঠে। বনকচু, আকন্দ, জার্মান লতা। গোরু দুটোও মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছিল। সরসর করে এক জোড়া বেজি ছুটে চলে গেল গায়ের পাশ দিয়ে। ইউসুফ নড়েচড়ে উঠল। মাটির নিচু ঘর। চালের ওপর কি যে নেই! সুপুরির পাতা, নারকেল পাতা, খড়, ছেঁড়া বস্তা, ভাঙা টিন।

ও বাশার মা। বাশার মা। ফিসফিস করে ডাকছিল ইউসুফ।

ঘরের ভেতর ভালো করে তাকানো যায় না। দিনের বেলাতেও সেখানে কুকাপ অন্ধকার। ঘরের পেছনে দুটো বড় বড় চালতা গাছ। তার পাতায় পাতায় চিকন রোদ। চালতা গাছের পাশে আশফলের সবুজ ছায়া। বড়, দলমল করে ঠেলে ওঠা একটা গাছ। তবে ছটাকি আশফল নয়, এমনি ছোট ছোট ফল। পাতার ভেতর দিয়ে হাওয়া বইলে কেমন যেন একটা ছমছম শব্দ ওঠে।

এরকম দুপুরেই নাকি জেন নামে। গলার কাছটা শুকিয়ে আসছিল ইউসুফের। সরসর সর সর—বাতাস বয়ে যাচ্ছিল পাতার ভেতর দিয়ে। চারপাশে আর কোনো শব্দ ছিল না। আর আবারও সেই দুটো বেজি বড় দ্রুততায় গায়ের পাশ দিয়ে চলে গেলে ইউসুফ নিজের মনে মনে একা একাই চমকে ওটে। বেজিরা উল্টো দিক থেকে ফিরছিল। তাদের রোঁয়াঅলা ল্যাজের শুধু শেষটুকু দেখতে পেল ইউসুফ।

বাশার মা। বাশার মা! এবারও কোনো সাড়া না পেয়ে ইউসুফ প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই বুড়ির এন্তেকাল হয়েছে। অনেকেই বলে, দু-দুটো ধাড়ি জেন পোষা আছে বুড়ির। তাদেরই কুদরতে বুড়ির খাওয়া-

দাওয়া। সেই পোষা জেনই কি বুড়িকে মারল! ইউসুফ আকাশে। পারছিল না। খালি তার গোরু কী ভেবে যেন এমনিই হাম্বে

বাশার মা। ও বাশার মা—বুঝি শেষ বারের মতো গলা জড়ো করে ডাক দিল ইউসুফ। তার গলার শব্দে কাঠঠোকরা ে উড়ে একটু দূরে একটা বাজপড়া তালগাছের মাথায় বসে আপন মনে ঠক। ঠক ঠকা ঠক। ঠক ঠকা ঠক করতে করতে কাঠ কেটে যেতে থাকল। তার রঙ বাহারি ডানায় ঝিলিক দিচ্ছিল রোদ্দুর।

বাশার মা, নিজের মনে ফিসফিস করে বলে নিয়ে আর ডাকব কিনা—এই সিদ্ধান্তটুকু না নিতে পেরে ইউসুফ যখন ফিরব কি ফিরব না—এমন দোনামোনায়—ঠিক তখনই দরজার আড়াল থেকে কে রে! কে এলি বাপ বলতে বলতে সেই মূর্তি—উঁলিঝুলি এক মাথা পাকা চুল, চোখের ওপর একটু ঝুলে নেমে আসা পাতা, সামান্য কুঁজো বাশার মা। পরনের শাড়িটি রঙিন। পরিষ্কার। তবে তাতে নানা সুতোর সেলাই। দু-একটা অন্য কাপড়ের তালিও।

কে রে বাপ—ফোকলা দাঁতে বুড়ি কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে।

আমি এচুপ! গওহর আলির নাতি।

আহা, বেঁচে থাক বাপ। আমার মাতার চুলির সমান তোর হায়াৎ হোক।

ও বুড়ি, তোর জন্যে চাল-কড়াই ভাজা—

আহা, আল্লার কি কুদরত। কাল রাত থেকে জ্বর। গালে পানি দেয়ার কেউ নি। তা তুই ফেরেস্তা বাপ। আহা, গওহরের নাতি, হবে না কেন! গওহর কত বড় দিলবালা এনসান। আমায় ভাত পাটায়। সঙ্গে ডাল, মাচের তরকারি।

একটা লালচে ফড়িঙ বোঁ বোঁ করে আপন মনে উড়তে উড়তে ইউসুফের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রোদ এখন বুড়ির সামনের দাওয়ায়। বাশার মায়ের পায়ের কাছে। কে যে বাশা, কে যে তার মা, ইউসুফের জানা নেই। তার দাদি বলে, বাশার মা। আব্বা বলে, বাশার মা। দাদা—গওহর আলি সর্দার, আমার মা ফেণিবিবি—সবাই ডাকে—বাশার মা। ও বাশার মা'। আমিও তাই বলি। এমন ভাবনার ভেতর ইউসুফ তার পকেটের চাল-কড়াই ভাজা বাশার মায়ের আঁচলের ভেতর মুঠো করে করে ফেলে দিচ্ছিল।

সেই ফড়িঙটা এখনও তেমনই ঘুরে ঘুরে আসছে। দূর থেকে কাঠঠোকরার গাছ কাটার আওয়াজ ভেসে আসছে—ঠক ঠক। ঠক। ঠকা ঠক ঠক। ইউসুফ

.খতে পাচ্ছিল বাশার মা-র বাঁ চোখের মণির ওপর ছাড়ানো আশফলের রঙ। গোরু দুটো আবারও হামলে উঠল। বুড়ির ফোকলা মাড়ি থেকে নাল গড়িয়ে নামছে গালের পাশে। খুব ক্ষীণ রেখা। তবু ইউসুফের চোখ এড়াল না।

আহা, বেঁচে থাক আমার বাপ এচুপ। আমার মাতার চুলির সমান হায়াৎ···বাশার মা আপন মনে বিড় বিড় করছিল! নিজের আঁচলে চাল-কড়াই বেঁধে বেড়ার দরজা ঠেলে অন্ধকারে বুড়ি মুছে গেলে ইউসুফের আর কিছু করার থাকে না। গোরু দুটোকে নিয়ে হাঁটাতে হবে ঘাসের মাঠ অব্দি। সেখানে কচি কচি চিকন সবুজ ঘাস। দুটো গোরু পেট ভরে খাবে।

হাঁটতে হাঁটতে বাদার দিকে মাঠে এসে গোরু দুটোকে খুলে দিল ইউসুফ। একটু ঘুরে খাক। নজর রাখতে হবে। গরম কামড়ে ধরছে চারপাশ। গোটা পৃথিবী ধীরে ধীরে তেতে উঠছে। তবু এই ফাঁকায় বয়ে যাওয়া বাতাসে শীতলতার ছোঁয়া থাকে। সেই স্পর্শে দুচোখে ঘুম ঘুম জড়িয়ে যাচ্ছিল ইউসুফের, ছোটখাট দু-একটা হাই। গা ভারি হয়ে আসে। ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লেই এখন ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু এর মধ্যে যদি চরতে চরতে গোরু দুটো দূরে চলে যায়, তাহলে কপালে যা পেটন আছে, ভাবতে ভাবতে ইউসুফ আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল। ঘাস খেতে খেতে দুটো গোরুই একটু দূরে গেছে। ঠিক আছে। আর বেশি দূরে না যায় দেখতে হবে। ভাবতে ভাবতে ইউসুফ ছায়া খুঁজতে লাগল।

তারপর সময় তো নিজের নিয়মেই গড়িয়ে যায়। বাড়ি যাওয়ার আগে ভালো করে দেখে নিতে হয় দুটো গোরুরই পেট উঠেছে কি না। টিপে টুপে দেখে নেয় ইউসুফ। ঠিক মতো টাইট হয়েছে তো! পেট না উঠলে পেটন আছে···ঐ গোরু তাড়াবার কঞ্চি দিয়েই ।

সূর্য নিজের নিয়মে মাথার ওপর উঠে আসছিল। টপটপ করে ঘাম মুছে নিলে উড়ে আসা হাওয়ায় শরীরটা জুড়োয়। গলা, মুখ, ঘাড়, বগল— সব একটু একটু করে মুছে নিচ্ছিল ইউসুফ। গায়ে রোদ লাগলে বড্ড ঘামাচি চিটপিট করে। বিশেষ করে গলা আর পিঠে। ছায়া খুঁজতে খুঁজতে ইউসুফ সেই বড় আশুথ গাছটার তলায় চলে এলো। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া। কি আরাম! বসলেই শরীর জুড়োয়। পেছনে একটা হাঁটু জল ডোবা। কোত্থেকে একটা কুকুর এসে সেই ডোবার পাড়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

এক ঝাঁক ছাতারে আবারও ধুলো রঙের ফুল হয়ে উড়ে গেল আকাশে। দূরে থেকে গোরুর দাঁতে ঘাস ছেঁড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ইউসুফ। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছিল। আজও ইস্কুলি যাওয়া হলো না। গোরু দুটো ভালো করে নেড়ে ঘাস না খাইয়ে ঘরে ফিরলে দাদি চিককুর পাড়বে। দাদা শুনলে বকবে। চাচা মার দেবে হয়ত।—পেট উঠিনি ক্যান রা্যা! কোতায় কোতায় হোল ডুবাডুব—অ্যাঁ! চাচা মইন আলি সর্দার দাঁত খিঁচোবে।

তার ছেলেরা কেউ ইস্কুলি যায় না। সব দেখে চুপচাপ চোকির পানি ফ্যালবে মা—ফেণিবিবি। আব্বা বলবে, আর আশকারা দিউনি—লেকাপড়া করে বাবু হবে সব। এসব বলতে বলতে নিজের মনেই গজ গজ করে যাবে আব্বা—মিজান আলি সর্দার। মা-র তো কথা বলার কোনো উপায় নেই।—চুপ মার। চুপ মার—বলে গোটা মহল্লা কাঁপিয়ে আব্বার গলা গলা শোনা যাবে। চাই কি দু-চার ঘা চড়-থাপ্পড়ও। একেবারে জড়িঘণ্ট ব্যাপার।

ইউসুফ মনে মনে ভাবে আব্বা-মা-মা-র এমন তর্কাতর্কি, রাগারাগিতে প্রথমে কই বুলকুনি—কথা কাটাকাটি। তারপর শোর কুদমি—ঠ্যালাঠেলি। আর সবার শেষে বাণ ছটকা—মারামারি। মারামারি নয়, একতরফা মারই খালি। মায়ের বুক-চাপা কান্না। গোটা ব্যাপারটা পরে মেয়েমহলে বাখানি করে বলবে দাদি জোবেনদানবিবি। হাত-পা নেড়ে। মুখ বেঁকিয়ে। গলার স্বর ওপরে নিচে তুলে। আব্বা কেমন করে ছড়া কেটে মাকে বলেছিল।

একে বলে দখিনে ভূত।

মুতে বলে খাই দুধ—তা দেখাতে দেখাতে দাদি তার তামাক লাগা দাঁত বের করে হাসবে। হাসতেই থাকবে।

চার

ও বাপ, এচুপ, আমার জন্যি এক আনার পেঁপের ফুল—সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই জোবেদানবিবি এমন করে আমায় বলে চলেছে। এক আনার পিপারমেন্ট আনতে হবে বটতলার অতুল আলি-মুকুর আলির দোকান থেকে। দাদি তামাকের সঙ্গে পিপারমেন্ট মিশিয়ে দাঁতে দেবে। তাতে নেশা আরাম—দুই-হতে থাকে। বটতলায় অতুল আলি মুকুর আলির

কাছেই পূর্ণ যুগির মুদির দোকান। হাঁটু অব্দি কাপড় পরে লম্বা, কালো মানুষটা বসে থাকবে। গায়ের ফতুয়া সব সময় কাঁধে। খালি পা দোকান থেকে কেউ বিড়ি কিনলেই তার থেকে বিড়ি চাইবে। বেশি নয়, ঐ একটাই। বসে বসে ফুঁকবে। এমনিতে চুপচাপ। কিন্তু বিচার পঞ্চাতের সময় একেবারে অন্য মানুষ। তখন নদে পান, বাবর আলি মণ্ডল, সন্ন্যেসী আলি সর্দার—সবার পাশে পূর্ণবাবু যেন বাঘ। ট্যা-ফোঁ করার উপায় নেই। সবাই বলে, কি উচিত বুদ্ধি আর কতা! কাকে বিশ ঘা বেত। কার পঞ্চাশ টাকা ফাইন, কার দশ ঘা জুতোর বাড়ি। কার পনের হাত নাকখত। কার বা দশ টাকা জরিমানা। সে বিচার নড়ানোর ক্ষমতা কারও নি। বাবা, পূর্ণবাবু বলেছেন। কতার নড়চড় নেই। যা বিচার, সেই বিচার।

ও বাপ এচুপ, আমার পেঁপের ফুল—উফ্, দাদি আমায় জ্বালিয়ে মারবে।

দাও। পয়সা দাও দিনি—বলতে বলতে ইউসুফ হাত পাতে।

এক আনার আনবি বাপ।

লাফাতে লাফাতে বটতলার দিকে ইউসুফের চলে যাওয়া। মাটির সোজা রাস্তা। দুপাশে গাছ। রাস্তার ওপর গ্রীষ্মদিনের ধুলো। হাওয়া পেলে ধুলোর গুঁড়ো পাউডার হয়ে ছাড়িয়ে পড়ে।

অতুল আলি-মুকুর আলির দোকানের সামনে নুনের বস্তা। এখন নুনের কিলো দশ নয়া পয়সা। দু-পয়সার নুনের জন্যে তাড়া দিচ্ছিল শেখ পাড়ার পেশকার। পেশকার আখের গুড়ও নেবে। বাটি বা অন্য কোনো জায়গায় আনে নি। খালি গায়ে পেশকার। বুকের হাড় কখানা হিসেব করে গোনা যায়। ইউসুফকে দেখে ময়লা মতো দাঁত জুবড়ে হাসল। মাথায় আমারই মতো প্রায়, কিন্তু কেমন যেন রোগা পাতলা। খালি পায়ে এক হাঁটু ধুলো। মাথায় ঝামরে পড়া রুখু চুল। প্যাণ্টের বোতাম নি। পেটের কাছে গেরো বাঁধা। পাছায় বড় তাপ্পি।

ইউসুফও হেসে দেয় পেশকারের দিকে তাকিয়ে। পেশকার তখনই আখের গুড়ের জন্যে একটা কচুপাতা ছিঁড়ে আনল। বলল, এর মধ্যে নুন, গুড়—সব দে দাও। দু পয়সার নুন, দু পয়সার এখো গুড়। পেট মোটা মাটির কলসির ভেতর থেকে লোহার খুন্তি দিয়ে গুড় বের করছিল মুকুর আলি। লম্বা হাতলঅলা খুন্তির টানে দু-একটা মাছি একটু দূরে দূরে গিয়ে উড়ে

বসছিল। কচুপাতায় গুড় আর নুন নিয়ে পেশকার আবার প্রায় সবগুলো দাঁত দেখিয়ে হাসল।

ইউসুফও ঘাড় কাত করে হেসে ফেলল।

আমায় এক আনার পেঁপের ফুল—বলেই জিভ কাটল ঋষি রাজনারায়ণ স্কুলের ক্লাস থ্রি-র ছাত্র ইউসুফ আলি সর্দার। দাদির মতো আমি পিপারমেন্টকে পেঁপের ফুল বলে ফেললাম! আমি না ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। এ বি সি চিনি। তবে ইংরেজিতে নিজের নাম লিখতে পারি না। আমি জানি ভারতের পরধানমনতরি জওহরলাল নেহেরু।

পশচিমবাংলার মুখ্যমনতিরি শ্রীপরফুল্ল চন্দ্র সেন।

এক আনার 'পেঁপের ফুল' দিতে মুকুর আলির কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। এমনটি শোনা তো তার নিত্য অভ্যাসে। দোকানের ভেতর দেয়ালে জওহরলাল নেহরুর হাসি মুখের রঙিন ক্যালেন্ডার স্থির ছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে হাসি। মাথায় শাদা ক্যাপ। বুকে লাল গোলাপ।

মুকুর আলির হাত থেকে পিপারমেন্ট মোড়া টুকরো কাগজের মোড়ক নিয়ে তিনটে দু-নয়া পয়সা ধীরে বাড়িয়ে দিল ইউসুফ। নিজের হাতের তেলোয় পয়সা নিয়ে, দেখে কাঠের কেঠোর ভেতর একগাদা খুচরোর সঙ্গে ছ-নয়া পয়সাকে সহজেই মিশিয়ে দিতে পারল মুকুর আলি। আর তখনই বাইরে রাখা নুনের বস্তার গায়ে একটা রাস্তার নেড়ি পা তুলে···।

ভাগ, ভাগ শালা। মোতার আর জায়গা পাস না—এই মুতো নুন নিয়ে এখন আমায়—দোকানের বাইরে কোনো খরিদ্দার চেঁচিয়ে উঠল।

শালা. আবার—দোকানের ভেতর থেকে ডাল তোলার লোহার হাতা নিয়ে মুকুর আলি বেরিয়ে এসেছে। অপকর্মটি সেরে সেই কুকুর ততক্ষণে পগার পার।

শালা আবার এখেনে এলে এবার তোমার ঠ্যাঙ ভাঙব। বার বার খ্যা—দেখিয়ে এই হাল। মুকুরের গলা থেকে রাগ গড়িয়ে পড়ছিল।

সত্যিই তো নুনের বস্তায় ঠ্যাঙ তুলে হিসি করা কুকুরকে কতবার খ্যা—মায়া দেখান যায়! ইউসুফ ততক্ষণে দোকানের পেরিয়ে রাস্তায়। ধুলো উড়ছিল হাওয়ার টানে। সারা রাস্তা ধুলোয় ধুলো।

উষার দিকে যেতে গিয়ে একটু এগোলেই অনেকখানি ফাঁকা মাঠ। বাঁ পাশে কুমোরপুকুর। চালতাগাছ। অর্ণবদের জমি। সবেদা বাগান। আতা বাগান। নোনাগাছ। বাঁশঝাড়। পূর্ণবাবুদের জমি।

বর্ষায় কুমোর পুকুরের কাছে এক কোমর জল। পরে জল নেমে গেলে এক হাঁটু থকথকে কাদা। রায়নগর ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলে মাঠের ভেতর চড়কের মেলা। আমরা সবাই মেলায় গিয়েছিলাম। পুতুলের দোকান। ভিড়। বাড়ির কাছাকাছি আসতে আসতে আবারও সারের গাদা থেকে উড়ে আসা পচা দুর্গন্ধ টের পেল ইউসুফ। নাকের ভেতর দিয়ে অনেকখানি গভীরে সেই গা-গুলোনো বাতাস পেঁছে যায়। এই খারাপ গন্ধটাকে এক লাফে পেরিয়ে বাড়ি এসেই ইউসুফ দেখতে পেল সাজিমাটিঅলা বসে আছে।

খুব ছোট করে কাটা একমাথা পাকা চুল। দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার মুখ। হাঁটুর কাছে তোলা ধুতি। পা—হাঁটুর নিচে অব্দি ধুলোয় ধুলো। কথায় কথায় লোকটি হাসে। এই-হি সা-জি-মা-টি বলে হাঁক দিতে দিতে মাটির রাস্তা ভাঙা সেই অবাঙালি মানুষটির পিঠে চটের বস্তা। তার ভেতর সাজিমাটি। দু আনা সের। দেখতে অনেকটা যেন ভেলিগুড়। মা কেনে, চাচি-মা, দাদি-সবাই। কাপড় কাচে।

উঠোনে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে কাঁঠালের ছায়ার নিচে বসেছিল সাজিমাটি আনা মানুষটি। তার পরনের লালচে ধুতি—শাদা রঙ কাচতে কাচতে যেমন হয়ে যায় - গায়ের ফতুয়াটিও সেরকম। পাশে সাজিমাটির বস্তা। লোহার সেরপাল্লা নামিয়ে লোকটি মাটি ওজন করবে। দাদি পয়সা দিয়ে নেবে। একটা শালিক বারে বারে সাজিমাটিঅলা মানুষটির পায়ের কাছে আসছিল। আর সেই মানুষ, যার নাম রামবিলাস, তেমন করে পাখিকে পাত্তা দিচ্ছিল না। একটা, দুটো, তিনটে—অনেক শালিক। তাদের গলায় ক্যাচোরম্যাচোর ঝগড়া।

রামবিলাস সেরপাল্লায় সাজিমাটি ওজন করছিল। তার পায়ের কাছে ঘুরেফিরে আসছিল একটা দুটো তিনটে শালিক। মাথার ওপর আগুন উগরে দেয়া সুর্য। রামবিলাস সাজিমাটি ওজন করতে করতে ঘামছিল। তার কাঁধে গামছা। কাঁঠালের সবুজ ভারি পাতার ভেতর দিয়ে মাজা কাঁসার বাসন রঙের রোদ আসছিল চুঁইয়ে চুঁইয়ে। আর তখনই ইউসুফের মনে পড়ে গেল আজ ইস্কুলি ঝেতি হবে। খেলা আছে। ফুটবল, আহা ফুটবল।

স্কুলের কাছে, মাঠে বলের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ইউসুফের জিভ বেরিয়ে আসছিল। রোদ, গরম। ঘাম। মাঠের পাশে যে বিরাট বকুল গাছ, তার ছায়ায় গায়ের জামা, পড়ার বই-খাতা।

চামড়ার বলের পেছনে ইউসুফ দৌড়চ্ছিল। পা লাগাতে পারছিল না।

খেলার আগেই সাইকেলের দোকান থেকে ছ নয়া পয়সা দিয়ে ব্লাডার পাম্প করিয়ে আনানো হয়েছে। চামড়ার বলের ভেতর রবারের ব্লাডার। তার গায়ে গোটা দুই গ্যাটিস। কিন্তু বল তেমন হালকা হয় নি। কেমন যেন ভারি মতো। শট মারতে গেলে পায়ে লাগে। তবু ইউসুফ ছুটছিল।

বলের সেলাইয়ের ওপর পা লেগে গেল কিক মারার সময়। একটু লাগল। ব্লাডার ভেতরে ঢোকানোর পর চওড়া লেস দিয়ে মুখটা বন্ধ করা হয়। সেখানে পা লাগলে ব্যথা লাগে। এ ছাড়াও এই বলের গায়ে মুচির ছুঁচ সুতোর সেলাই আছে।

হাফ টাইমে আইসক্রিম। আইসক্রিমঅলার কাঁধে চৌকো বাক্স, তার ভেতর পাঁচ নয়া পয়সার কাঠি গোঁজা আইক্রিম। শাদা, লাল, কমলা, সবুজ— চার রঙের। সন্ধ্যা পদ্মরাজ আমাদের ক্লাসে পড়ে। তাকেও একটা আইসক্রিম কিনে দিয়েছি। আমি খেলে ওকেও খাওয়াই। শাদা, ঝকঝকে দু সারি সাজানো দাঁত। তার গায়ে লাল রঙের কাঠি-আইসক্রিম। সন্ধ্যা চুষছিল।

পোদেদের বাড়ির এই মেয়েটার গায়ের রঙ কালো। কিন্তু চেহারাটা যেন ঘট, এত সুন্দর। ইউসুফ তার ভাসা দু চোখ, একটু চাপা নাক, সাজানো দাঁতের সারি দেখতে পাচ্ছিল।

কাঠির ডগা থেকে রঙিন বরফ নিজের শাদা বরফ-কুচি দাঁতে ভেঙে নিচ্ছিল সন্ধ্যা। আর তারপরই হাফটাইমের পর খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

আকাশে কোত্থেকে মেঘ উড়ে এলো একটুকরো মেঘ। গোলের খুব কাছে এসেও বল মারতে পারল না ইউসুফ। নিজেকে সামলাতে না পেরে, শূন্যে পা ছুঁড়ে জোর আছাড় খেল। ভাঙা আইসক্রিম মুখে হেসে উঠল সন্ধ্যা। দাঁড়িয়ে প্যান্টের পাছা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দেখতে পেল ইউসুফ। খুব রাগ হলো। আর তখনই তাদের টিম এক গোল খেয়ে আবার গোল শোধের জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল।

এক টুকরো উড়ো মেঘ জমতে জমতে কালো করে তুলেছিল আকাশ। গরম মাটি আর ধুলোর ওপর বৃষ্টির ফোঁটা নেমে এলে তার কি এক সুগন্ধ ভাসে চরাচরে। নাক টেনে টেনে সেই ঘ্রাণ নিতে নিতে বল ধরতে চাইছিল ক্লাস থ্রি-র ইউসুফ। আইসক্রিমের শেষটকু শাদা দাঁতে ভেঙে ফেলেছিল সন্ধ্যা।

মাঠের অনেকটা দূর থেকে ফাঁকা প্রান্তরে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে আসছিল

বৃষ্টি। ঝাঁক বাঁধা বৃষ্টির ফোঁটা। ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়, যে জলবিন্দু সহজেই শুষে নিতে পারে গরম ধুলো, তৃষ্ণার্ত মাঠ। তারপর জোরে। আরও জোরে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধুলোঘাঁটা বন-চড়াইরা একটা শেকল হয়ে আকাশে উড়ল। তারপর ভাসতে ভাসতে ভাসতে আমগাছের সবুজে, ঘন ডাল-পাতার আড়ালে তারা মিশে গেলে ইউসুফ ছুটল নিজের বই বাঁচাতে। জামা, বই-খাতা, সব বকুলতলায়। সেখানে পেঁছে ইউসুফ দেখতে পেল দুটো ইটের ওপর বই-খাতা জামা দিয়ে ঢেকে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে হাসছে।

মাঠে খেলা ভেঙে গেল। এরপর বাড়ি ফেরা। স্কুল তো আগেই ছুটি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা কিছু বলছিল না। ইটের ওপর থেকে নিজের খাতা-বই, জামা কুড়িয়ে ইউসুফ ফিরবে। বৃষ্টি ধরে এলো। বন-চড়াইয়ের সেই ঝাঁকটি আমগাছের সবুজ থেকে উড়ে আবারও কোনো নিবিড় ছায়ায়—অন্ধকারে। কয়েকটা শালিক, দোয়েল, গাঙশালিক বৃষ্টির পর ঘাসের আড়াল থেকে কেঁচো, পোকা খুঁটে নিতে ততক্ষণে মাঠে নেমে এসেছে।

বাড়ি ফিরে পায়ের কাদা-ধুলো পানিতে ধুয়ে ফেলল ইউসুফ। এখনও সন্ধে লাগে নি। এক পশলা বৃষ্টির পর আরও বেশি গরম মিশে গেছিল বাতাসে। গোইলে গোরু হামলাচ্ছিল। সন্ধের মুখে ছাগল ডেকে ডেকে ছাগল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল দাদা ইউসুফ। দাদাও আমাদের ইস্কুলি পড়ে। আজ যায় নে। ইউসুফ মনে মনে ভাবছিল।

আকাশ মেঘে মেঘে গম্ভীর। জোরে বাতাস বয় না। কেমন যেন একটা থম ধরা গরম চারপাশে। সামনের উঁচু মাটির দাওয়ায় বিছন বেছাচ্ছিল দাদি।

পানি হয়ে গেলে বাঁচি। একটু পরেই শোভান আসবে—বলতে বলতে দাওয়ায় একটা কেরোসিনের লম্প রেখে গেল দাদি। তার কালচে ধোঁয়া, লাল মতো আগুন। ইউসুফ একা দাঁড়িয়েছিল। আমার চাচা মইন আলি সর্দারের জানের দোস্ত শোভান আলি গাজি পুঁথি পড়বে। ইউসুফের মনে পড়ল তার দাদির কাছেও অনেক পুঁথি—সোনাভান, হাতেমতাই, সখি সোনার কেচ্ছা, ইউসুফ-জুলেখা, নেকবিবির কেচ্ছা, লায়লি-মজনু, বনবিবি জহুরানাম, নিজাম পাগলের কেচ্ছা, শাশুড়ি-জামাইয়ের ঝগড়া, অর্থাৎ ঘর জামাইয়ের বিবরণ—এরকম কত কি!

আর আছে খয়রল হাসার। বড় বড় অক্ষরে, লালচে কাগজের ওপর

ছাপা। আমি দেখছি কতদিন নেড়েচেড়ে। বানান করে করে একটু একটু পড়তে পারে দাদি। বড়মা পারে মা-ও পারে। চাচিমা পারে না।

আকাশ থেকে আলো কখন যেন সরে গেছে। লম্পের লালচে আলো, আগুনের বুক থেকে উঠে আসা কালো শিস ইউসুফের ছায়াটিকে বড় করে মাটির দেয়ালে ফেলে দিয়েছিল। একজন দুজন করে এসে বসছিল বিছনের ওপর। মোতালেব, ওর মা। আমার বড়বুবু, ছোটবুবু। চাচিমা, মা— একে একে সবাই। ছেলেরা একদিকে। মেয়েরা আর একদিকে।

বটতলার জমরুদ্দিন গাজির নাতি শোভান আলি গাজি এসে গেছে। মা, চাচিমা, বড়বুবু তাকে পানির বদনা, গামছা এগিয়ে দিচ্ছিল। ভালো করে হাত-পা ধুল শোভন চাচা। তারপর বিছনের ওপর বসল। সুতির পরিষ্কার রঙিন লুঙ্গি তুলে পরা গাঁটের ওপর। হাতা গোটানো ফুল শার্ট। এই বয়সেই শোভান চাচার মাথার মধ্যিখান বেশ ফাঁকা। নিচু হলে আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায়।

শোভান চাচার এমন আর কি উমর! আমার চাচা মইন আলি সর্দারের সমান সমান! চুল উঠে গিয়ে মুখটা খানিকটা বুড়োটে দেখায়। শোভান চাচা পড়তে আরম্ভ করবে। সবাই চুপ। ইউসুফের মনে পড়ল ক দিন আগে দাদি বলছিল, এটা ইসলামি মাসের আট নম্বর মাস—শাবান, এ মাসেই সবে বরাত। মহরম মাস দিয়ে যে চাঁদের শুরু, তা পর পর এরকম—সফর, রবিয়ল আওয়াল, জমাদিয়াস সানি, রজব. শাবান, রমজান, সওয়াল, জিলকদ, জিলহজ।

আমরা এক এক মাসকে এক এক চাঁদ বলি। এই সবেবরাত-এর মাসে ঘরে ঘরে পুঁথি পড়া হবে। তাতে যদি বাদলা নামে, তাহলে তো কথাই নেই। সবেবরাত-এর দেড়খানা চাঁদ পরে রোজার ঈদ। ইউসুফ আলি সর্দার মনে মনে হিসেব করছিল।

শোভান চাচা আজ খয়রল হাসার পড়বে! দূরে কোথাও বুঝি শেয়াল ডেকে উঠল —পর পর। উঠোনে অন্ধকারে জোনাকির ফুল। লম্পর আলো যেটুকু গড়িয়ে পড়েছে নিচে তাতে অন্ধকার কাটে কি কাটে না। সামান্য আবছা হয়ে কেমন যেন আরও ছমছমে হয়ে ওঠে। মোতালেব এসে বসল ইউসুফের পাশে।

দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করল শোভান আলি গাজি

বিসমিল্লা বলিয়া আমি ধরিনু কলম ॥
যদি আল্লা মেরা পরে করহ রহম
জবানেতে জান মেরা দিবেন এলাই ॥
তোমার মেহেরে লিখি কলম থোড়াই
মধুর স্বরেতে যেন পারি রচিবারে ॥
মতির মতন গাঁথা হয়ে থরে থরে
ওয়াস্তের সমান যেন গাঁথনি সে হয় ॥
দোওয়া চাহি আল্লা তোমার দরগায়
শুনে লোক পড়ে যেন ছেদেক নিয়েতে ॥
একিন হালে সাফ দেলে শোনে সকলেতে
পহেলাতে হামদো ছানা শোনে লেহ ভাই ॥
থোড়াছা বয়ান আমি সবাকে শোনাই
খোদার তারিফ লেখে সাধ্য আছে কার ॥
নারিল ফেরেস্তা জেন যত পয়গম্বর
হুর পরি আদম আর পরেন্দা জানওয়ার ॥
সকলে লিখিতে ভাই না হবে শোমার
আসমান জমিন হয় কাগজ তুমার ॥
সকল দরেস্ত কলম করিয়া তৈয়ার
তামাম দরিয়ার পানি কালি বানাইয়া ॥
কেয়ামত তক যদি লেখেন বসিয়া
তবু নাহি হদ তার হইবে শোমার ॥
হেদ তারিফ দেই পরওয়ার দেগার
কুল মখলু কাত নারে করিতে বয়ান ॥
আমি কি লিখিব ভাই নাপাক নাদান
আল্লার নামেতে আমি করিয়া ছকুদ ॥
নবীজির নামে ফের ভেজিয়া দরুদ
কলম ধরিনু আমি রাহেতে আল্লার ॥
আল হামদো লিল্লাহে তায়ালা শোকর হাজার
আশা মেরা পুরা কর গফুরের রহিম ॥

নাপাক নাদান কহি কমিনা খাদিম
বহাল রাখিবে আল্লা আমার ইমান ॥
দাগা নাহি দেয় যেন দুশমন শয়তান····

পয়ার ছন্দে পুঁথি বড় সুন্দর পড়ে শোভান চাচা। তার সামনে কাচ পরিষ্কার করা হারিকেন। সকালে চাচিমা শুকনো ছাই দিয়ে চিমনি মাজছিল। ঝকঝকে হবে। তাতে পরিষ্কার আলো হয়।

হারিকেনের সামনে একটু ঝুঁকে পুঁথির ওপর চোখ আটকে সুর করে পড়ে যাচ্ছিল শোভান আলি গাজি। তার ছায়াটি পড়েছে বিছনের ওপর। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। দূরে কোথাও বুঝি পানি হচ্ছে—এমন কথা বলছিল কেউ কেউ।

লম্পের ধোঁয়া ওড়ান লালচে আলোর ভেতর সারি সারি মাথা। শোভান আলি পড়তে পড়তে হাবিল আর কাবিল দুই ভাইয়ের কিস্যায় চলে যাচ্ছিল। কাবিলের ছেলেরা হিন্দু। হাবিলের ছেলেরা মুসলমান। হবা ও আদমের দুই সন্তান এরা।

শোভান আলির পড়ার ভেতর, গলার সুরে কি যেন কি থাকে। মেয়েরা ঘন ঘন চোখ মুছছিল। ঘরে দোলনায় ইদ্রিস। মা মাঝে মাঝেই উঠে দোলনায় শোয়া আমার ছোট ভাইটিকে দেখে আসছিল।

হাবিল-কাবিলের উপাখ্যান ছাড়িয়ে শোভান চাচা কখন যেন 'হাসরে মোরদা উঠিবার বয়ান'-এ পেঁছে যায়। বড়রা তাদের আধা জানা, আধা অজানার ভেতর এই দুনিয়ার তের কোটি গুণ বড় হাসরের ময়দান দেখতে পাচ্ছিল। সূর্য অনেক, অনেকটা কাছে নেমে এসেছে। সমস্ত মাটি হয়ে উঠেছে তপ্ত তামা। কেয়ামতের দিনে রোজা-জাকাত-হজ-নামাজ – আর আরও নানান শরিয়তি নিতকিত পালন করা ইনসানের রুহ তাঁর আরশ—সিংহাসনের ছায়ায়। তাঁরা বিশ্বাসী মানুষ। পুণ্যবান।

এই বিচারের ময়দানে পার্থিব সম্পদের—ঘর-বাড়ি, টাকা-কড়ির কোনো কিছুরই দাম নেই। বিশ্বাসী মানুষ ছায়ার আশ্রয়ে। অবিশ্বাসীরা অনুশোচনায় আঙুল কামড়াচ্ছে। কেন আমরা রোজা, জাকাত, হজ, নামাজ করিনি। হায় আল্লা। আঙুল কামড়াতে কামড়াতে তারা কনুইঅব্দি খেয়ে ফেলছে। তবু কোনো রাস্তা নেই। একটা নেকি—পুণ্য, কেউ এখানে

কাউকে দেবে না। অবিশ্বাসীদের ঘামে ঘামে জলময় হয়ে উঠেছে হাসরের ময়দান।

এই ভয়ের ছবি সবাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। পরহেজগার, ইমানদার না হলে কী কী হতে পারে, এমন সব আতঙ্ক ফুটে উঠছিল সেই বর্ণনায়। হাসরের ময়দান, কেয়ামতের দিনের কথা ভেবে অনেকেই খুব আস্তে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

শোভান আলি গাজি পড়ে যাচ্ছিল—

পরে আল্লা তালা আপে খোদা ওন্দ করিম।।
পয়দা করিবে জেন্দা এসরাফিল আমিন
রুহ মোবারক যদি এসরাফিল পাবে ।।
আল্লা হো আকবর বলে উঠে খাড়া হবে
সেই সিংগা হাতে লিয়া অতি কাতরেতে ।।
নিন্দ হইতে লোক যেন উঠে বেহুশেতে
বড় ঘোর নিন্দ হইতে উঠিবে জাগিয়া ।।
এই রূপে কত সাল রবে দাঁড়াইয়া
তারপরে আল্লা পাক রহিম রহমান ।।
এই জমি জেন্দা করে কুদরতে আপন
আন্ডার মতন এই জমি ভেসে রবে ।।
সেই জমি রচাইবে পানি কমে যাবে
এই জমিনের ধড় বজরার আকার ।।
তাহাতে বখশিবে রুহ আগে পরওয়ার
আসমান হইবে ভাই সাবেক মতন ।।
আল্লার হুকুমে ফের হইবে গঠন
তারপরে আল্লা পাক যক জানদার ।।
সবাকার বীজ রাখে হাতে আপনার
আদম এনসান দেখ যত জাহানাতে ।।
সবাকার বীজ আছে এই কোমরেতে
আলি, রোস্তম দুই হাড় অতি ছোট আছে ।।
আতশে জ্বালায়ে লাশ হাড্ডি যায় বেঁচে
নাভি সাথে সেই হাড্ডি মিলাইয়া রয় ।।

রগ রেশা হাড্‌ডি ফের পয়দা হবে তায়
জমিতে পড়িলে লাশ সব যাবে সরে ॥
আলবেন্জাস দুই হাড় রহিবে যে পড়ে
আতশে না জ্বলে তাহা মাটিতে না খাবে ।
এই হাড় হইতে ধড় ফেরবান হইবে
তারপরে আসমানেতে যত নানদার ॥
সকলে হইবে জেন্দা অ দেশ খোদার

পড়তে পড়তে জামার পাশ পকেট থেকে রুমাল তুলে মুখ মুছে নিচ্ছিল শোভান আলি। ভেতরে বেশ গরম। পাশে রাখা তালপাতার পাখায় এক দু'মিনিট বাতাস খেয়ে নিয়ে একটু জড়ানো গলায় শোভান বলল, পানি।

ইউসুফের বড়বুবু জুবেদা কাচের গ্লাস ভর্তি পানি আনল। গ্লাসের গায়ে ফুল আঁকা। একচুমুকে পুরো পানি ভেতরে নিয়ে গিয়ে শোভান আলি গাজি আবারও মুখ মুছে নিল। তার গোঁফটি খুবই সরু। পরম যত্নে ছাঁটা। পানিতে গোঁফ লাগলে পানি না-পাক হয়ে যাবে। তাই এমনভাবে ছেটে নেয়া।

জুবেদার হাত থেকে পানির গ্লাস নিতে নিতে শোভান রুমালে আর একবার মুখ মুছল।

ইউসুফের মনে হচ্ছিল খয়রল হাসার পড়তে পড়তে শোভান চাচার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। হায় রে সে কেয়ামতের দিন। কি ভয় কি ভয়! ইউসুফেরও গলা শুকিয়ে আসছিল।

হারিকেনের আলোর পাশে শোভান আলি গাজির কালো ছায়াটি ভেঙে শুয়ে আছে। দূর থেকে শেয়ালের হুক্কা হুয়া শোনা যাচ্ছিল। বাতাসে ঠাণ্ডা আঁচড়। শোভান আলি গাজি ঘাড় সামান্য নিচু করে পুঁথির পাতায় মন দিল—

ইল্লিন সিজিন হইতে যত রুহলিয়া ॥
সিংগার ভিতরে সব দিবে যে পুরিয়া
সেই সিংগা লম্বা এত কি কব বয়ান ॥
হাদিসে খবর আছে শোন ভাইজান
সেথা সূর্য ওঠে আর সেথা গিয়া ডোবে ॥
সিংগাখানা এত লম্বা জানিবেন সবে

তাহার ভিতরে রুহ্ পুরিবে তখন ॥
কসম খোদার দিয়া আপন আপন
যে যাহার কালেবেতে বসিবে যাইয়া ॥
খবরদার কেহ কারে না যাবে ছাড়িয়া
পরে আওয়াজেতে কবে ইয়ারান জলিল ॥
এইবার সিংগা ফোঁক শোন এসরাফিল
গায়েবী আওয়াজ শুনে এসরাফিল তবে ॥
সেই সিংগা মুখে দিয়ে ফুঁক লাগাইবে…

হালকা মতো ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল চারপাশে। অনেকেই শাড়ির আঁচলে চোখের কোণ মুছে নিচ্ছিল। ছেলেরাও পুথির সুরে, শব্দে কেঁদে ফেলে। বাইরে অন্ধকারে আলোর ফুল উড়িয়ে জোনাকি উড়ছিল।

তারপর একটু রাতে পুথিপাঠের আসর ভেঙে গেলে এশার নামাজের আজান ভেসে আসে বাদামতলা মসজিদ থেকে। আর আকাশ ভেঙে তখনই পানি নামে।

পুথি শোনা মানুষেরা অনেকেই বাড়ি চলে গেছে। দাওয়ায় পাতা বিছন ঠিক মতো গুছিয়ে রাখছিল দাদি। মা লম্প নিয়ে গেল রান্নাঘরে। শোভান চাচা চা খাবে। সঙ্গে বিস্কুট। জুবেদা চা নিয়ে আসছিল।

বৃষ্টির গুঁড়ো উড়ে আসছিল হাওয়ার সঙ্গে। আর তখনই মইনচাচা ফিরল, সারাদিন মাছ ধরার চেষ্টা করে।

কি রে, পেলি কিছু? চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শোভান জিগোস করছিল।

না—বেকার গেল সারা দিনটা। উঠোনে নোটা থেকে পানি ঢেলে ঢেলে পা ধুচ্ছিল মইন আলি সর্দার।

এক পশলা পানির পর সার গাদার পচা গন্ধ আরও যেন ঘুলিয়ে উঠছে হাওয়ায়, ইউসুফ টের পাচ্ছিল।

রাতে দাদির পাশে, এক বিছানায় শুয়ে ইউসুফ হাই তুলছিল। একপাশে বড়বুবু জুবেদা, একপাশে আমি। দাদা ছোটবুবু নাসিমা আলাদা জায়গায়। নাসিমা, ইদ্রিস মায়ের সঙ্গে। দাদা গওহর আলি সর্দারের সঙ্গে শোবে, এক খাটে।

খাটের ওপর শুয়ে সুতির শাদা মশারির ভেতর দিয়ে জানলার ওপারে

অন্ধকার নিস্তব্ধ পৃথিবী দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ। গাছের পাতায় দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ। দূরে ব্যাঙ ডাকছে—কটকট। কটকট। জোবেদান-বিবি পাশে শুলে তার গা থেকে অন্যরকম একটা গন্ধ পায় ইউসুফ।

ও দাদি, গল্প বল - বলতে বলতে ইউসুফ হাই তুলবে। না-ঘুমোনো পর্যন্ত তার গল্প শোনা চাই। দাদির মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জর্দার পরিচিত ঘ্রাণ ভেসে আসবে।

বড়বুবু দাদিকে বলবে তার দিকে ফিরতে। আমি বলব আমার দিকে। দাদি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকবে। গল্প বলবে। সেই যে হজরত আলি। যাঁর গায়ে খুব জোর। তিনি পৃথিবীকে একদিকে হেলিয়ে দিতে পারেন। একজন বাঁদীর হাত থেকে মাটিতে তেল পড়ে গেলে হজরত আলি মাটি তুলে নিয়ে নিংড়ে নিংড়ে তেল বের করে নিলেন।

দাদির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পান-জর্দার গন্ধ ভেসে আসছিল। —হজরত আলির কম্বর রয়েছে উটের পিঠে। তাঁর কুঁজের ভেতর। পৃথিবী হজরত আলির শরীরে ভার রাখতে পারবে না—বলতে বলতে দাদিরও হাই উঠছিল। আজমীর শরিফের খাজাসাহেব রাজা পৃথ্বীরাজের ওপর রেগে গিয়ে সেই রাজ্যের সব জল নিজের নোটায় পুরে ফেললেন— দাদির কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে কখন যেন ইউসুফও ঘুমিয়ে পড়েছে।

শেষ রাতের দিকে আবারও একবার ঝেঁপে বৃষ্টি এলে, জোবেদান বিবি তার কাঁথার নিচে আদরের নাতিটিকে টেনে নিতে নিতে বাইবে চরাচর আলো করে বাজ পড়তে দেখল। সেই আকাশ-আলোয় পাড়ের সুতোয় সূঁচের কাজে কাঁথার গায়ে ফুটিয়ে তোলা মসজিদ, চাঁদ-তারা, দাড়িঅলা বাউল—সব হঠাৎ ফুটে উঠেই অন্ধকারে মুছে গেল।

এসবই আমার মা জিন্নত বেগমের তৈরি, একলা জেগে এই অন্ধকারে নিজের মা-কে মনে পড়ে যাচ্ছিল জোবেদানের। আকাশ তখনই ডেকে উঠল—কড়কড়·· কড়াত কড়াত···।

নড়ে চড়ে সোজা হলো ইউসুফ। তারপর আধো ঘুমে, আধো স্বপ্নের ঘোরে যেন বা কাঁথার বাইরে বেরিগে গেছে, ঠান্ডা লাগছে—এমন অনুভব থেকে বলে উঠল—আবার কুঁড় কই দাদি! কুঁড়! কাঁথার কোণটি খুঁজে নিতে চাইছে বালক, ঘুমের মধ্যে। ভালো করে গা-হাত-পা ঢেকেঢুকে দিয়ে শুয়ে পড়ল জোবেদান।

ঘুমের প্রথম দিকে একটু যেন পুঁথি পড়ার স্বপ্ন মিশে গেছিল। সেই

খায়রল হাসার। তারপর সেই স্বপ্নের সব সরে গেলে ইউসুফ চৈত্রের ধুলোর গন্ধ পায়। শুকনো পাতা উড়ছে। আর সে সময়ই, ফাল্গুন চৈত্র মাসে শ্রীপুর থেকে হাজাম আসে। চার-পাঁচ-ছ বছরের খোকাদের চ্যাট-কাটানি। সুন্নত।

বাঁশের ধারালো চ্যাচারি। চামড়া টেনে এনে তা দিয়ে খত্‌না। কাজ করা নতুন পাঞ্জাবি, পাজামা। টুপি। ফুলের মালা। খানাবাড়ি। গোস পরোটা সিমাই। মামা বাড়ি থেকে আরও একটা পাঞ্জাবি। সবাই সাহস দিচ্ছে, ইউসুফ আমাদের কত হিম্মতদার। ওর লাগবে না। কত সাহস।

হাজাম বেচু আলি ঘর থেকে আনা ন্যাকড়া পুড়িয়ে রক্ত বন্ধ করার মশলা, পুলটিস তৈরি করছে। বাতাসে কাপড় পোড়া গন্ধ। তারও অনেক অনেক বছর আগে নাকি ঘুঁটের ছাই, যেমন পাঁঠাকে খাসি করার সময়। সে সব শোনা ছিল ইউসুফের দাদির কাছে।

বাড়িতে মিলাদ বসেছে। বাতাসা, শরবত। লোকজন।

চ্যাট কাটানির পর দিন সাত আট লুঙ্গি পরে থাকা। যাতে প্যাণ্টের ঘষায় ঘষায় ঘা না ছড়ায়।

শ্রীপুর থেকে আসা বেচু হাজামের মাথায় তেলচিটে, ময়লা মতো টুপি। বহু বছর আগে যা শাদা ছিল। দাঁতে জর্দা পানের দাগ।

উঠোনে ধুলো উড়ছিল। সবাই সাহস দিচ্ছে ইউসুফকে। ইউসুফের কি সাহস, কি হিম্মতদার লোক। এবার সে বড় হয়ে উঠবে। সকলে সাবাসি দেবে।

ঘুমের ভেতর পাশ ফিরে ইউসুফ আবারও তার স্বপ্নে ফিরে গেল। খত্‌না করার পর বেচু হাজাম পাঁচটা টাকা পাবে। সঙ্গে চাল আর আলুর সিধে। সারা বছর চাষবাস আছে। শুধু এই ফাল্গুন চৈত্রে তার ডাকাডাকি খুব। সকলেই প্রায় এই সময়টা বেছে নেয়। নয়তো হিন্দুদের বড় পুজোর পর পর শীত পড়ার আগে।

ঘুমের মধ্যেই চৈত্রের ধুলোর গন্ধ, ব্যথা, রক্তের ঘ্রাণ পাচ্ছিল ইউসুফ। তার ঘোরের ভেতর নিজের অজানতেই কি এক ভয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ চেপে ধরছিল দু হাতের পাতার আড়ালে। যদি আবার কাটা যায়, যদি আবারও বেচু আলি আসে। কাপড় পুড়িয়ে, তার ছাই আর বাঁশের চ্যাচারির ছুরি নিয়ে বসে! তারপর তাকে ডাক দেয়, ও বাবু—এগিকে—আর সকলের দেয়া সাহস পেরিয়ে নিজের দু হাতের তালুতে প্রাণপণে তলপেট চেপে ইউসুফ ছুটবে, ছুটবে—

ঘুমের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠছিল ইউসুফ। একটি বিশাল গাছ, রোদ তার ছায়া, উঠোন—চৈত্র বাতাসে উড়ে যাওয়া ঝরা পাতা—সব তালগোল পাকিয়ে গেল। তার গালে সেই সব উড়ে আসা শুকনো পাতারা ছুঁয়ে যাচ্ছিল, যেমন কোনো প্রাসাদের সামনে একলা একলা দাঁড়ান মার্বেল মূর্তির গায়ে পাতার স্পর্শ।

আর তখনই জোবেদান তার হাঁসেদের বেড়ে ওঠার স্বপ্নে ছিল। নূর আলির কাছ থেকে কেনা হাঁস, একটা, দুটো, তিনটে—অনেক। শাদা, কালো, ছাই ছাই—তাদের হলুদ ঠোঁট, কালচে ঠোঁট। পুকুরের জল নড়ে উঠছিল ডানার শব্দে।

সমস্ত পুকুরের পানি ছেয়ে গেছে হাঁসে! কত হাঁস। তারা কেউ কেউ পাড়ে উঠে এসে ডানা ঝাপটে ঝাপটে জল ঝাড়ছে। সেই জল কণা রোদ লেগে মণিবিন্দু হয়ে যায়। আহা, কি তার বর্ণালী! এমন রোশনি বোধহয় ফেরেস্তারা এলে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। অন্তত জোবেদান তো সেরকমই জানে।

হাঁসের ছোট রঙিন, শাদা পালক একটি দুটি ফুল হয়ে বুঝি শুয়ে পড়ছিল সবুজ ঘাসের ওপর। ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছিল যে হাঁসেরা, তারা সবাই এক সুরে ডেকে উঠল। তারপরই সেই সব ছবি, হংসধ্বনি মুছে গিয়ে ফুটে উঠল ডিম, ডিমের সারি।

সদ্য পাড়া ডিম হাতে নিলে তার ওম্ একেবারেই অন্য রকম মনে হয়। ছুঁলে আহ্লাদ ভেসে ওঠে মনের ভেতর। জোবেদান তার স্বপ্নের পর্দা জুড়ে শুধুই ডিম দেখতে পাচ্ছিল. তার সঙ্গে পয়সার ঝংকার শোনা গেল। ছন্, ছন্ ছনন্—

ঘুমের মধ্যে দাদিকে খুঁজতে গিযে ইউসুফ আবারও সেই কাল্পনিক ব্যথায় জড়িয়ে যাচ্ছিল। তলপেটে সে এক নিদারুণ কষ্ট। লুঙ্গির ঘষায় যন্ত্রণা পেতে হয়!

ঘুম আর ব্যথার মাঝখানে থেকে ইউসুফ জোবেদানকে হাত বাড়িয়ে খুঁজছিল।

পাঁচ

সকালে বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু আকাশ মেঘবতী। পুকুরঘাটে নতুন কেনা ছটা হাঁসই পায়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় সাঁতরাচ্ছিল। তাদের পাখায়

নতুন নতুন রঙ। কাঁঠালের পাতায় গতরাতের বৃষ্টির দাগ। আজ রোদ উঠবে কিনা জোবেদানবিবি বুঝতে পারছিল না। কাঁঠালের ছায়ার নিচে বসে নিম দাঁতনে দাঁত মাজছিল ইউসুফ। পুকুর জলে মেঘলা মতো আস্ত একখানা আকাশ ভেসেছিল।

আজ ইস্কুলি যাব না। বরং পৌষিদের বাড়ি—এমন ভাবনার ভেতর এ দিকটায় এসে ফাঁকায় তাকাতেই ইউসুফ দেখতে পেল দিঘির পাড়ে তালগাছের মাথায় একরাশ কালো মেঘ, বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়ার অপেক্ষায়। নিমডালের কষ একেবারে ভেতর অব্দি চলে যাচ্ছিল ইউসুফের। একটা তেতো ভাব ছড়িয়ে ধরছিল জিভ। বাচ্চা হাঁসেরা দড়ির লম্বাটুকু সাঁতার দিয়ে দিয়ে আবারও পাড়ে পোঁতা খুঁটির দিকে ফিরে আসছিল।

আর কদিন পরই সবেবরাত। জোবেদান নিজের মনেই ভাবছিল। ফকির-মিশকিনদের জন্যে হালুয়া-রুটি তৈরি করানো আছে। আর সবেবরাত গেলেই তো দেড়খানা চাঁদ—দেড় মাস পর ঈদ। রোজার মাস শুরু হয়ে যাবে। উনতিরিশটা রোজা। রোজা রাখা। সকলের সেহরির ভাত, তরকারি, দুধ-বাতাসা,কলা। এফতারের ছোলা ভেজানো, ফল, শরবত। জোবেদান হাতের কাজ সারতে সারতে এইসব ভাবনায় পোঁছে যাচ্ছিল।

আর একটু বেলা বাড়লে ফ্যানা ভাত আর কাঁঠাল বিচি সেদ্দ দিয়ে হাপুস হুপুস খেয়ে নিচ্ছিল ইউসুফ, ইউনুস, জুবেদা, নাসিমা। শুধু ফ্যান মাখা ভাত আর কাঁঠাল বিচি, সঙ্গে এক খাবলা নুন। কি স্বাদ কি স্বাদ! কাঁঠাল বিচি হাঁড়িতে দেয়ার জন্যে ভাতের রঙও একটু লালচে মতন। কি মিষ্টি ভাত আর কাঁঠাল বিচি।

বুড়ো আঙুলে টিপে কাঁঠাল বীজ ভাঙার মজা কত!

উঠোনে তাগড়া লাল মোরগটা তার হলুদ ঝুঁটি ফুলিয়ে বাঙ দিচ্ছিল। পায়ে পায়ে মাটি আর ঘাস আঁচড়ে আঁচড়ে পোকা খোঁজা মুরগিরা কেউ কেউ ঘাড় তুলে তাদের স্বাস্থ্যবান কর্তার দিকে তাকাচ্ছিল।

থালা চেটে, হাতের চেটো আঙুল জিভ দিয়ে চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছিল ইউসুফ। দাদি এমন করেই আমাদের খেতে শিখিয়েছে। মা-ও।

একটু বেলা বাড়লে মেঘলা, ছায়ামাখা রাস্তার ওপর শ্রীপুর থেকে আসা সেই চুড়িওয়ালি ভেসে উঠল। তার হলুদ শাড়িটির উজ্জ্বলতা বুঝিবা সমস্ত ছায়া সরিয়ে দিতে পারে। হাতের কাপড় মোড়া ঝুড়িতে কাচের চুড়ি। হলুদ লাল সবুজ কালো নীল—বাড়ির মেয়েরা, বৌ-রা ভিড় করবে। মাটির

দলিজ ঘর উঠোনের কাঁঠালগাছ পেরিয়ে, গোরুর গোইল, ছাগল রাখার ঘর, হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় পেরিয়ে আরও খানিকটা অন্দরে চলে আসতে পারে চুড়িওয়ালি। তার উজ্জ্বল হলুদ শাড়িটা বুঝি সব মেঘলাভাব শুষে নিতে পারে।

উঠোনে পাতা-কাঠ-জেবলে আগুন করার গোটা দুই উনোন। মাটি খুঁড়ে তৈরি সেই সব চুলোর গায়ে নারকেল পাতা, প্যাঁকাটি, ক্যাকচা, বেগুন পালা, ঢ্যাঁড়শ পালা জ্বালানোর কালচে দাগ। একটা বড় মাটির গামলা এক পাশে। তার এদিকে কাঠ কাটা ছোট হাতকুড়ুল, কাটারি, চ্যালা করা কাঠ।

ফেণিবিবি কাঠ কাটতে কাটতে উঠে গেছে একটু আগে। তার নীল শাড়িতে দু-একটা বৃষ্টি-ফোঁটার দাগ।

চুড়িওয়ালিকে ঘিরে মেয়েরা ভিড় করেছে। তাদের এই নিস্তরঙ্গ অন্তঃপুরে এখন কিছুটা বাইরের খোলা হাওয়া। চুড়ি পরাতে পরাতে হলুদ শাড়ির সেই নারী বড় হাসে। তার সাজানো দাঁত আমাদের ইস্কুলের সন্ধ্যা পদ্মরাজেব মতো—ইউসুফ মনে মনে মেলাচ্ছিল। এর গায়ের রঙ অনেক ফরসা। মুখে দু-এক ছিট মেচেতা। পানের কষে লাল ঠোঁট।

চুড়িওয়ালির কথায় হাসিতে দামি কাচ ভাঙছিল। তাকে ঘিরে বসা অন্য মেয়েরাও কী কী সব বলতে বলতে এ ওর গায়ে ভেঙে পড়ছিল।

জোবেদান বিবি চুড়ি পরবে। বড়মা, মা, চাচিমা। বড়বুবু, ছোটবুবু। চুড়িওয়ালি দাদির থেকে পান চেয়ে খাবে। পানের বোঁটায় সামান্য চুন। টুকটুকে লাল জিভে চুন মাখা বোঁটাটি ছুঁইয়ে দিলে লাল, সবুজ শাদার যে রঙবাহার, তা ইউসুফের চোখ এড়ায় না।

তোমরা কি বখিল গো—আর চার আনা—চুড়িওয়ালি আমার দাদিকে কৃপণ বলছে—ইউসুফ একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল।

আর নয় গো—দাদি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল।

তোমাদের এখানে এলে এত ভালো লাগে, মনে হয় জান কেটে খাইয়ে দি—এরকম কত কি বোঝাতে চাইছিল চুড়িওয়ালি। ফেণিবিবি হাত-কুড়ুলে ঠক ঠকাস, ঠক ঠকাস শব্দে কাঠ কাটছিল। রান্নার জন্যে কত যে জ্বালানী লাগে!

নিজের ঝুড়ির মধ্যে চুড়ি সাজিয়ে নিয়ে, শাদা কাপড়ে বেঁধে উঠে পড়েছিল চুড়িওয়ালি। ইউসুফ তখনও কাঁঠালগাছের ছায়ায়। পেছন

থেকে হলুদ শাড়ি পরা সেই নারীর চলার ছন্দে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল ইউসুফ। তখনই দু-এক ফোঁটা, দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি নেমে এসেছিল চরাচরে। আর সেই বৃষ্টির স্পর্শেই বুঝি-বা কোনো শিহরিত ঘুঘু কাঁঠালতলা থেকে আরও দূরে, কোনো সবুজ নিরুদ্দেশে যাওয়ার জন্যে উড়ান দিল।

একটু অন্যমনস্ক ইউসুফ প্রথমটায় শুনতে পায়নি, পরে আবারও মোতালেব ডাক দিলে, তাদের দলিজের সামনের সিঁড়িতে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়ে ইউসুফ দেখতে পায় দলিজের দরজার চৌকো ফ্রেমে মোতালেব বুঝি বা ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে।

দলিজের দরজার ফ্রেমে যে চৌকো অন্ধকার, তার ওপর লেপে থাকা মোতালেব, তখনও খালি পায়ে, আজ তার পরনে দড়ি বাঁধা প্যান্ট, যা কিনা লম্বায় হাঁটু অব্দি। চারপাশে যখন সকাল থেকেই মেঘলা বিকেল হয়ে আছে, সেই আবছা আলোয় মোতালেবদের দলিজ— যেখানে এক সময় অনেক হাঁকাহাঁকি, ভিড়, লোকজন, বিচারসভা—তার কিছুই আজ নেই। বাইরের লোক এলে তার ভেতর বাড়িতে যাওয়ার হুকুম ছিল না। সবাই এখানে। খাওয়া-দাওয়া, পান, তামাক, কথাবার্তা। দলিজের কপালে শ্বেতপাথরের ওপর ৭৮৬।

বাংলায়—তারপরের লাইনে, আশরাফ ভবন—সবই এই বৃষ্টি হব হব দুপুরে আবছা হয়ে আছে।

তোর গা ধোয়া হয়ে গেছে? মোতালেব ইউসুফের স্নানের খবর নিচ্ছিল।

ইউসুফ ঘাড় নাড়ল। নাহ, হয়নি।

দলিজে ঢোকার দরজার দুপাশে দুটো দুটো চারটে—থাম, তাদের মাথায় চওড়া পাপড়ির ফুলের ডিজাইন, সবই ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল। সামনের ছাদের কার্নিশ ভেঙে এসেছে। সেখানে আশুথ গাছের দেয়াল ফাটানো শিকড়, রোদ-হাওয়া শুষে নেয়া নবীন পাতা। পাকুড়, বটও আছে, এখানে-ওখানে। দলিজের সামনে, থামের এপাশে-ওপাশে মুরগি-মুরগা কি কি যেন সব খুঁটে খুঁটে বেছে খাচ্ছিল। দলিজঘরে ঢোকার প্রাচীন সিঁড়িটিও পাশ দিয়ে ভেঙেছে। সিঁড়ির একপাশে বড় ডুমুর গাছ। তার খসখসে পাতায় মেঘলা মতন আলো।

আমাদের বাড়ি আজ পুথি পড়া হবে। বিষ্টুকাকা পড়বে—মোতালেবের

গলায় আহ্লাদ ফুটে উঠছিল। কি পুঁথি পড়া হবে, তা নিজেই বলে দিতে চাইছিল মোতালেব। ইউসুফের শুনতে ইচ্ছে করল না।

আয় না, আমাদের বাড়ি। মোতালেব ডাক দিচ্ছিল। দলিজের অন্ধকার ফ্রেম ভেঙে পুরনো সুরকি, আরশোলা, খড়ের গন্ধ, ভিজে কাঠ আর আরও কোন কোন অজানা ঘ্রাণ পেরিয়ে গোয়ালের পাশ দিয়ে ইউসুফ মোতালেবদের বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। মোতালেবের বাবাকে দেখলে খুব রাগি মনে হয় ইউসুফের। চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না।

তোর আব্বা আছে? মোতালেবের কাছে ইউসুফের জানতে চাওয়া।

হেঁ—মোতালেব ঘাড় নাড়ে।

তালি থাক। ইউসুফ যেতে চায় না।

চল, আব্বা খ্যাতে গ্যাচে।

ইউসুফ নিশ্চিন্ত হয়।

মোতালেবদের শোয়ার ঘরের দেয়ালে আজমীর শরীফের ছবি। ওর দাদি গেছিল গেল বছর। ঘরের চার কোণে চারটে ছোট ছোট পানির বোতল। ঘর বন্ধন হয়েছে। মোতালেবের গলাতেও কালো কারে বাঁধা রুপোর তাবিজ। ডান হাতে দুটো মাদুলি। রাতে বিছানায় ঘুমের ভেতর হিসি করে ফেলে মোতালেব। তাই আটকাতেই এসব দোয়া-তাবিজ!

ইউসুফ জানে পেটে ক্রিমি আছে মোতালেবের। আর তাই বিছানায়…। একবার ছোট বাটির আধ বাটি কেরোসিন খেয়ে মোতালেব তো যায় যায়। শেষে কলকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে— অনেক টানাটানির পর বাঁচে। বেশ কয়েকদিন হাসপাতলে। মোতালেবের দাদি বলে, আল্লার কুদরত আর নেহাৎ ওর হায়াৎ ছিল, তাই বেঁচেছে। নইলে এতদিনে কবে কব্বরে চলে যাওয়ার কথা।

এই মোতালেবই একদিন সকালে গরম ভাতের সঙ্গে চুন মেখে খেয়ে মুখ পুড়িয়ে একেবারে যা-তা কাণ্ড। পানের জন্যে জলে ভেজানো পাথুরে চুন ফুটে উঠতে উঠতে গলে দই। সেই নতুন গোলা চুন দিয়ে গরম ভাত মেখে খাওয়া। তিন চার গরাস খেতেই জিভ পুড়ে, ফুলে ঢোল। কে যে তাকে এসব বলে আর মোতালেব তা বিশ্বাস করে কি করে, ইউসুফ বুঝতে পারে না। আর এখন আব্বা আয়নাল আলি মণ্ডলের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে

মোতালেব যখন ইউসুফকে বলে, আয় এচুপ, তখন আয়নাল আলি মণ্ডলের গম্ভীর মুখখানা ভেবে ইউসুফের পা ওঠে না।

আয় না। মোতালেব ডাকে। আর ইউসুফ ভেজানো দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে কেমন যেন একটা ভিজে ভিজে গন্ধ টের পায়। ঘরের ভেতর মোতালেবের আব্বার থামি—লুঙ্গি শুকোচ্ছে। দেয়ালে মহম্মদ রফির রঙিন ছবি একখানা। একপাশে কাবা শরিফ। এঘরে নিচু চৌকি আছে একখানা বসার জন্যে। আর একপাশে বড় চৌকির ওপর বিছানা—সেখানে শোয়াব ব্যবস্থা। একপাশে গড়গড়া রাখা আছে। আমার দাদা গওহর আলি সর্দার, আব্বা মিজান আলি সর্দার—সবাই হুঁকোয় তামাক খায়। তাদের হুঁকোয় এত বাহার নেই—ইউসুফ মনে মনে বলছিল।

লুডু খেলবি? মোতালেব জানতে চাইল।

নাহ্, ঘাড় নাড়ল ইউসুফ। তার দম আটকে আসছিল এই ভেজা ভেজা গন্ধঅলা ঘরে। বাইরে আকাশ বুঝি বা আরও কালো হয়ে এসেছে। মোতালেবের আব্বার ঘর থেকে বেরিয়ে গোয়ালের পাশ দিয়ে দলিজ পেরিয়ে পুকুর পাড়ে এসে মোতালেব দেখতে পেল আকাশ থেকে নেমে আসা এক-দুফোঁটা বৃষ্টি পুকুরের পানিতে মিশে যাওয়ার আগে হাতের দু-আঙুলে মেঝেয় রেখে ঘোরানো রঙিন প্লাস্টিকের লাট্টু হয়ে টুপটাপ পুকুরের পানিতে মিশছে। পায়ে দড়ি বাঁধা হাঁসেরা এখনও সমানে সাঁতার দিয়ে যাচ্ছে জলে। তাদের গলায় অবিরাম প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক। ইউসুফ শুনতে পাচ্ছিল।

আকাশ থেকে উড়ে আসা দু-একটি বৃষ্টি ফোঁটায় রোমাঞ্চিত হতে হতে দিঘির পাড়ে, তালগাছের পাশে পৌষিদের ঘরের সামনে এলে ইউসুফ দেখতে পায় পৌষি দিঘি থেকে পানি আনছে। হাতে বালতি। একদিকে কাত হয়ে গেছে মেয়েটা। মুখে কষ্টের রেখা।

ইউসুফের খুব ইচ্ছে হলো বলে, ও পৌষি দে, আমি পানির বালতিটা পেঁছে দি। আর তারপরই মনে হলো, ওরা কি আমার ছোঁয়া পানি খাবে! যেমন খ্যাতে—ইউসুফের মনে পড়ছিল আমাদের জমিতে যে সাঁওতাল, হাজারিবাগ থেকে আসা মুনিষেরা কাজ করে, তারা কেউ আমাদের ছোঁয়া বা হাতের জল খায় না। অনেকটা মাটি কোদাল কুপিয়ে টিপিন বেলায় ওরা চাল পানিতে ভিজিয়ে মুঠো মুঠো চিবিয়ে খাবে। সেই চাল আমরা দেব, এইসব ঠিক আছে। কিন্তু পানি ওরা আনবে। অনেকটা দূরে

পুকুর, সেখান থেকে। একবার আমি নোটায় ভরে পানি এনে ঢেলে দিয়েছিলাম ওদের চালে। আহা! এই রোদে বড্ড পেরেশান বেচারিরা। খুব খাটছে। গায়ের খুন পানি হযে বেরিয়ে আসে, এত রোদের তাত! এখন পানিতে চাল ভিজিয়ে খেলি ওদের জান ঠাণ্ডা হবে। নোটার পানি ওদের চালে ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম। শুকনো চাল গামছার ওপর। চাল নিয়ে এসেছি বাড়ি থেকে। পানি ঢেলে দিতে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, খুব জোরে।

আমি তো অবাক। সেই চাল আর কেউ খায়নি। নষ্ট হবে বলে বাড়ি নিয়ে আসা। দিঘি থেকে বালতি করে জল তুলে আনছে পৌষি। মায়া আর রবে—দুই ভাই দাওয়ায় বসে একটা পুরনো ঢাক বাঁধাবাঁধি করে সারিয়ে নিতে চাইছিল। মেঘলার বাজারে ঢাকের শব্দ উঠছিল ঢুব ঢাব ঢুব···ঢুব ঢাব ঢাব—কেমন যেন ভোঁতা মতন।

ইউসুফের কানে লাগছিল। পৌষি একপাশে ঝুঁকে বালতি ভরা জল আনছিল দিঘি থেকে। তার ডান হাতে বালতি। বাঁ-হাতটি সবুজ ফ্রকের নিচেটা খানিকটা তুলে রেখেছে। পৌষির শ্যামলা ঊরু একটু কালচে হয়ে যাওয়া হাঁটুর মালাইচাকি দেখতে পাচ্ছে ইউসুফ। এমন সময়ে খেলার কথা বলা যায় না। দাঁড়িয়েও থাকা যায় না এমনি এমনি। নিজেকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছিল ইউসুফের। চুপ করে চলে আসা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না।

দিঘির পাড়, কয়েকটা তালগাছ পেছনে ফেলে ইউসুফ তাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবারও তাকাল পৌষিদের বাড়ির দিকে। আর তখনই দিঘির জল পেরিয়ে ভেসে যাওয়া আলকেউটেকে দেখতে পেল। কেউটে কখনও তার শরীর ল্যাজ জলের নিচে নেবে না। মাথা তো ডোবাবেই না। তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা কেউটে বড় তাড়াতাড়ি জল কেটে ওপারে যেতে চাইছিল। নিজেদের মাটির দলিজ, পাঁচিলের দরজা—সদর, গোল-পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর, যেখানে যে কোনো গরমের দুপুর বড় শান্তিতে কাটানো যায়, ঘুম আসে—সব পেরিয়ে ইউসুফ তাদের উঠোনে পৌঁছে গেল।

বৃষ্টি তেমন করে নামল না। বাতাস গুমোট হয়েই রইল। কমল না গরমও। তবু কখন যেন মেঘে মেঘে বেলা। সকাল শেষ হয়ে দুপুর। দুপুর ফুরিয়ে বিকেল। তারপর বিকেলও একসময় সন্ধ্যায় ডুবে যায়।

মোতালেবদের বাড়ি পুঁথি পড়তে এসেছে বিষ্টুপদ সর্দার। ওর ছেলে শশী আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সর্দার পাড়ায় বাড়ি। বিষ্টুকাকার মালকোঁচা দিয়ে টেনে ধুতি পরা। পায়ে ফিতে দেয়া খড়ম। নীল রঙের একখানা হাফশার্ট গায়ে। বিছন পাতা হয়েছে মোতালেবদের দাওয়ায়। হারিকেন রেখে গেছে মোতালেবের দাদি।

দূরে অন্ধকার ফাঁকা দলিজ একা দাঁড়িয়ে। তার মাথায় গায়ে যে বট-পাকুড়-অশ্বত্থের শেকড়, ডাল-পাতা, তাও এই অন্ধকারে আলাদা ভাবে চেনার কোনো উপায় নেই।

বিছনের ওপর বাবু হয়ে বসেছে বিষ্টুকাকা। সামনে পুঁথির খোলা পাতা। কাল যেমন আমাদের বাড়ি হয়েছিল, তেমনেই আলাদা আলাদা দু-সারিতে বসা ছেলেমেয়ে। বিষ্টুকাকার চোখে চশমা। নাকের নিচে ঝুরো একখানা গোঁফ। সুর করে পুথি পড়ার সময় কখনও কখনও সেই গোঁফ কেঁপে ওঠে। টুকটাক কথা বলছিল কেউ কেউ। পড়া না শুরু হওয়া অব্দি এমন ফিসিরফুসর চলবে—ইউসুফের জানা। বারদুই কেশে, গলা পরিষ্কার করে বিষ্টুকাকা পড়তে শুরু করল—

বাদশা ছিল নামদার, মালের শোমার তার, আল্লা বিনে কেহ নাহি জানে॥
হাতেম পাইয়া দাম, করে ছাখাওতি কাম, খেলান পেলান লোকজনে
এলাহির রাহা পরে, বহুত ইয়াদ করে, কাঙালে মেহের করে বড়া॥
রাহি মোছাফের লোক, খিলাইয়া রাখে তাকে, খেদমতে হাজির হাতজোড়া
যে কেহ মুশকিলে ঠেকে, দেলাসা করিয়া তাকে,
মুশকিলে আশান করে তার॥
ছোট বড় সবাকারে, বহুত মেহের করে, কভুকারে না করে বেজার
শক্ত কথা কার তরে, না কহে গোস্যার ভরে, নরম জবানে করে বাত॥
বেগানা কামের তরে, আপনি মেহের করে, যে রূপে সে কাম হয় হ'ত
রাহা ঘাটে কেহ তারে, আসিয়া ফরিয়াদ করে

বিষ্টুপদ সর্দার ত্রিপদী ছন্দে হাতেম তাই পুঁথি পড়ছে। বড়রা বুঝতে পারছিল। বাইরে খুব ধীরে বৃষ্টির শব্দ। সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙ। লম্পের লালচে আলোর ভেতর অন্ধকার জড়ানো সারি সারি কালো মাথা।

নতুন করে পয়ার সুরে পড়া শুরু করল বিষ্টুকাকা।

ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল—

পিয়াসে হাতেম তাই আছিল বেহাল॥
খাইয়া পানির ঝরনা হইল খোসাল
নজর করিয়া দেখে পানির অ.ড়ায় ॥
বেশুমার মতি কত গড়াগড়ি যায়
লাখ টাকা এক এক মতির মূল্য তার ॥
ময়দানে পড়িয়া কত কে করে শোমার
ময়দান উপরে মান দেখিয়া মোতির ॥
লালচ হইল ছেলে হাতেম তাইর
ছেলে করে দুই চারি মোতি উঠাইতে ॥
ইয়াদ হইল মানা করিয়াছে লিতে
হাত সামটিয়া বসে পানির কিনারে
পেরেশান ছিল মর্দ পিয়াছের জোরে
থোড়া পানি উঠাইলে পিবার খাতির
দুধ হইবে বেশি রঙ্গ ছফেদ পানির
সহদ হইতে মিঠা মজা মিলে তার ॥
হাতেম হয়রান দেখে কুদরত আল্লার····

বিষ্টুকাকার পড়ার সুরে ইউসুফ হাতেম তাইকে দেখতে পাচ্ছিল। বাইরে খুব আলগা আলগা বৃষ্টির শব্দ। লম্ফর কেরোসিন পোড়া গ্যাসে বাতাস কেমন যেন একটু ভারি হয়ে আছে। ইউসুফ শুনতে পাচ্ছিল বিষ্টুকাকার গলায় পয়ারের সুর—

ময়দানে ময়দানে হাতেম কয় রোজ যায় ॥
সামনে পাহাড় এক দেখিবারে পায়
চড়িল যাইয়া সেই পাহাড় উপর ॥
দেখিল মাকুল ঠাঁই তক্তা বরাবর
গালিচা বিছানা তার নজদিকে তালাও ॥
আরামের জাগা গাছে বহে মন্দা বাও
খোলছা মকান তায় বিছানা পাইয়া ॥
আরাম করিল সেথা হাতেম যাইয়া
কতক্ষণ আরামে শুইয়া নিন্দ যায় ॥
না ছোটে নিন্দের ঘোর ঠান্ডা হাওয়া তায়
জায়গার মালিক তার আসিয়া পেঁছিল ॥

হাতেম শুইয়া তার নজদিকে বসিল
হাতেম উঠিল যদি চেতন পাইয়া ॥
বসিয়াছে এক মর্দ দেখে তাকাইয়া
সালাম করিয়া তাকে রাখিয়া আদাব ॥
পরি মর্দ দিলা তাকে সালামের জওয়াব
পুছিতে লাগিল বাত হাতেমের তরে ॥
কোথা হইতে আইলে তুমি যাবে কোথাকারে
হাতেম বলিল যাব দস্তক হাবেদায় ॥
আসিবার যত বাত বলিল তাহায়····

আর এভাবেই এক সময় আসর ভেঙে যায়। বিল্টুকাকা মোতালেবের দাদির দেয়া চা-বিস্কুট খেতে থাকে। হারিকেনের আলোয় বারে বারে তার ছায়াটি নড়েচড়ে। ভেঙেচুরে আবারও সোজা হয়ে যায়। টিপটিপ বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ঘরে ফিরতে ফিরতে দু-এক জন নিজেদের ভেতর বলাবলি করছিল—এ-কদিন গরমে ভালো ঘুম হয়নি। আজ দেয়ালে না চোরে সিঁদ দেয়।

শোয়ার আগে গহর আলি সর্দারকে পান দিতে হয় জোবেদানের। হারিকেনের কমানো আলোয় খাটের ওপর নিজস্ব পুরুষটিকে দেখতে পেল জোবেদান বিবি। গওহর আলির একপাশে ইউনুস শোবে। পানিতে ভালো করে গোসল করে এসে গামছায় হাত-পা, ঘাড়-মুখ মুছতে মুছতে বহুদিন পর যেন গওহর নিজের বিবিকে দেখছিল। ওপাশে আরও একটু দূরে সেই কাঠের প্রাচীন সিন্দুক তার গায়ের নকশা, পেতলের কল ধরা ম্লান কবজা নিয়ে অন্ধকারে স্থির।

তাড়াতাড়ি নিজের বুকের কাপড়—ছতর, ভালো করে টেনে দিল জোবেদান। এখনও এই চাউনির ঘোর সারা শরীর ঘিরে লজ্জা নামে। সেই লাজুক শিহরনটুকু না জানি কতদিন পর জোবেদানের শরীর জুড়ে। গওহর আলির চওড়া, লাঙল করা হাতের পুরুষালি পাঞ্জা। পান দিতে জোবেদান চমকে উঠল। এচুপ শুয়ে পড়েছে? গম্ভীর গলায় গওহর জানতে চাইছিল। তখনও তার হাতে জোবেদানের দেয়া পান। সেই পাঞ্জার ভেতর আমার হাত আজ ডুবে যায়নি। ডুবলে আমিও বোধহয় ডুবতাম। ইয়া আল্লা। সবই তোমার রহেম। আমার ঘর ভরা নাতি-নাতনি। জোবেদান নিজেকে সামলাচ্ছিল।

নাহ্—মাথা নেড়ে শুধু এটুকু বলেই জোবেদান প্রায় ছুটে তার স্বামীর ঘর ছেড়েছিল। প্রায় পঞ্চাশের শরীর তবু ভেতরে ভেতরে তেতে উঠেছিল। জোবেদান এসে উঠোনে দাঁড়াল। মাথার ওপর আকাশে তারা দেখা যায় না। সেখানে শুধুই মেঘের খেলা। তবে কি রাতে বৃষ্টি নামবে!

ঠাণ্ডা বাতাস জোবেদানের শরীর জুড়িয়ে দিতে চাইছিল। আমার শাদির পর ঐ মানুষটা 'বেহশতের কুঞ্জি' নামে একটি মোটা কেতাব থেকে কিছু কিছু জিনিস পড়ে শুনিয়েছিল। আমার তখন অক্ষর জ্ঞান নেই। এখন তো তবু কোরান শরিফ পড়ার মতো আরবি জানি। একটু একটু বাংলাও—অন্তত যাতে বানান করে পুথি-কেতাব পড়া যায়। বইয়ের একটা জায়গায় ছিল স্বামীর খায়েশ পূরণ করা বিবি-র ফরজ। আমি কি আজ সেই ফরজ পালন করলাম না! তাহলে কি আমায় দোজখি·· জোবেদান বিবির গলায় কান্নার দলা আটকে যাচ্ছিল।

আমার শরীর যেন তপ্ত তাওয়া। খসমের খায়েশ না পুরিয়ে আমি বুঝি দোজখি হব। হায় আল্লা, রোজ কেয়ামতের দিনে আমার যে কি হবে—এমন ভাবনার ভেতর কুলকুল ঘেমে উঠছিল জোবেদান। মুসলমান মেয়ে কি যে নাচার। মেঘভরা আকাশ তেমনই স্থির। চারপাশে অসহ্য গুমোট। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকল। ধীরে ধীরে এসে নিজের স্বামীর ঘরের দরজা আলতো হাতে সামান্য ঠেলে খুলতেই জোবেদান দেখতে পেল গওহর আলি সর্দার চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার কাঁচা-পাকা মাথাটি, সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি—ফরসা, রোমশ বুক—যাদের বুকে লোম থাকে, তারা আল্লার প্রিয় হয়, এমন সংস্কার নিয়ে কোনো অপরিচিতার মতোই দাঁড়িয়েছিল জোবেদান।

খুব ধীরে শ্বাস পড়ছিল গওহর আলির। তার পাশে কাঁথা চাপা দেয়া ইউনুস। খুব বড় করে ছাড়া নিশ্বাসে তার বুক ভাঙল।

ঘরের নিভু হ্যারিকেনে আলো কম, কালি বেশি। খড়ের চালে আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল। খাটের ওপর দাদু-নাতি—নিশ্চিন্ত ঘুমে। জোবেদানের কিছু করার ছিল না। পাখির পায়ে ঘরে ফিরে এসে চুপি দিয়ে বিছানায় উঠে জোবেদান দেখতে পেল জুবেদা চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার পরনের ফ্রক উঠে এসেছে হাঁটুর কাছে।—কোনো হায়া নি, মুসলমানের মেয়ে, কদিন পর জেনানা হবি—বলতে বলতে জুবেদাকে একপাশে শুইয়ে দিল তার দাদি।

এক কাত হয়ে ঘুমোচ্ছিল ইউসুফ।

ও এচুপ বাপ আমার, বলতে বলতে নাতির গালে একটি দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিতে পারে জোবেদান। আর ইউসুফ বুঝি ঘুমের ভেতর হাতেম তাইয়ের খোয়াব দেখে—সেই দুধ রঙের পানি, তার স্বাদ মধুর থেকেও মিষ্টি। স্বপ্নের ভেতর ইউসুফ হাতেম তাই হয়ে যেতে থাকে। তার গালে ফুটফুটে হাসির রেখা আঁকা হয়ে যায়।

ইউসুফের গায়ে সুন্দর নকশি কাঁথাটি টেনে দিতে দিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে জোবেদান, ভাই-বোনের মাঝখানে। আজ তার মাথাটি গরম। দুকান দিয়ে আগুন ফুটে উঠতে চায়।

কখন যেন কার্তিক চৌকিদার—এই হো—এই হো—না কি পাহারাওয়ালা জাগো—এরকম কিছু বলতে বলতে লাঠি আর লণ্ঠন হাতে জানলার থেকে বেশ কিছুটা দূরে, মাটির দলিজের সামনে আরও খানিকটা খালি ভূমি সার গাদার পর পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। চারপাশের এই নিবিড় আঁধারে তার হারিকেনের আগুনটুকু যেন বা কোনো তীক্ষ্ন ফলা হয়ে বিঁধে যাচ্ছে। বেশ কয়েকদিন গরমের পর আজ বৃষ্টি নেমেছে। চারপাশে ঠাণ্ডা। এই কুকাপ অন্ধকারের ভেতর একলা পাহারাঅলা কার্তিক। এত বড় অঞ্চল, কতগুলো বাড়ি। সবই তো মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। চোরে তো সিঁদ দিতেই পারে।

জোবেদান জেগে থাকতে চাইছিল। তার কানপিঠে, নাকের পাটায়, নাভি, তলপেটে যেন বা আগুনের আঁচ। চোখের সামনে'বেহশতের কুঞ্জ'-র খোলা পাতা ফরফর করে উড়ে যাচ্ছিল। যত খায়েশ শুধু পুরুষমানুষের! মুসলমান মেয়ের কোনো খায়েশ নেই? তার কি শরীর জাগে না? কোনো পুঁথি, গায়েবি কেতাবে একথা তো বলা নেই। আমি তহলে কি করব!

শরীরের ভেতর জেগে ওঠা দোজখের ওমকে—তাকে নরকের আগুন বলেই বশ মানাতে চাইছিল জোবেদান বিবি। আর তার এই খায়েশটুকু ভেবে নিয়ে নিজের ভেতরই লজ্জায় লাল হতে হতে বুঝি-বা কখন যেন ঘুমে পেঁছে গেছিল। রাত আরও বাড়লে শেয়ালের চিৎকার আরও স্পষ্ট শোনা গেলে জোবেদান কোথায়, কোন মাঠে যেন দাঁড়িয়ে ছিল। সে এক শীতের সকাল। ধান কাটা ফাঁকা মাঠ। আকাশের রঙ নীল কাচ। পাশে বড় দিঘি। তালগাছের সারি। বাতাসে হিম মিশে আছে। জোবেদান সাপের শব্দ

দেখতে পাচ্ছিল। নিজের শরীর দুটিকে জড়িয়ে, পাকিয়ে নিয়ে তারা কি এক খেলায় ছিল। মাদি কেউটে। নর ঢ্যামনা—দাঁড়াশ সাপ।

তারা শঙ্খের ভেতর গড়াতে গাড়তে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে অনেকখানি জায়গা চলে যেতে পারছিল। কারা যেন গরম কাপড়চোপড়, নতুন কোরা ধুতি-শাড়ি, গামছা এনে পেতে দিচ্ছিল ফাঁকা ময়দানে। যদি এই কাপড়ের ওপর দিয়ে, গামছা ছুঁয়ে জোড়াসাপ চলে যায়, তাহলে সেই কাপড় বা গামছাটি তুলে নিয়ে টিনের বাক্সর কোণে রেখে দেয়। সৌভাগ্য বন্দি থাকবে—এমনই বিশ্বাস।

সর্প-মিথুনের গায়ে শীতের বাসি হলুদ রঙের রোদ পড়েছিল। তাদের চকচকে চামড়ায় সেই আলো ডুবে গেছে। দিঘির জলে অল্প অল্প ঢেউ উঠছিল। শঙ্খলাগা দুটি সাপ মাটি থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে সোজা করে নিজেদের তুলে ধরেছে। ল্যাজের ভরে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত শরীর। জোবেদানের সারা শরীর কাঁটা দিচ্ছিল। মাঠের ওপর সোজা, খাড়া হয়ে থাকা দুটি সাপ আবার জমিতে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকখানি চলে যাচ্ছিল।

এসব দেখার জন্যে চারপাশে বেশ ভিড়। অনেকেই গামছা, কাপড় পেতে দিয়েছে মাটিতে। যদি একবার সৌভাগ্য উঠে আসে। এমন কি রবে মুচিও তার ঘরে রাখা নতুন গামছায় শঙ্খলাগা সাপ দুটি উঠে আসুক—এমনটি প্রার্থনা করছিল হাতজোড় করে। দূর থেকে আরও কেউ কেউ কাপড় ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

শীতের বাতাসে কোথা থেকে যেন উড়ে আসছিল বোঁটা খসা বুড়ো বুড়ো পাতা। তার ছোঁয়ায় চমকে উঠল জোবেদান। আর তখনই তার ঘুম ভেঙে গেল। এই জেগে ওঠার ভেতর বুঝি-বা কোনো প্রাচীন লজ্জা খেলা করে যাচ্ছিল তার সারা শরীরে। কাঁথার নিচে ভ্যাপসা গুমোটের ভেতর কুল কুল করে ঘেমে উঠছিল জোবেদান।

ছয়

আর এভাবেই সবেবরাত এসে গেলে জোবেদান, আর ছেলের বৌ-রা রুটি হালুয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফকির-মিশকিন আসবে। খাবে। দোয়া চাইবে। আজ সকালে রোদ তার পৃথিবী ভাসানো চেহারা আর গরম নিয়ে হাজির

হয়েছে। মাটির উনোনে কাঠের আঁচে চালের আটার রুটি করতে করতে জোবেদান, ফেণিবিবি, মইন আলিসর্দারের বৌ মরিয়মবিবি শকুর আলিসর্দারের বউ আয়েষাবিবি—সবাই কাঠের আঁচে, ধোঁয়ায়, গরমে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।

আমার চাচিমা অত কাঠের আগুন, ধোঁয়া সহ্য করতে পারে না। কাশি আসে। কাশতে কাশতে চাচিমার ফরসা মুখ রাঙাপানা—ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল। বড়আম্মা, চাচা, আব্বা—সবাই বাড়িতে।

তিন ভাই—শকুর আলি সর্দার, মিজান আলিসর্দার, মইন আলি-সর্দার তাদের বাবা গওহর আলিসর্দারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে। এসবই ঘুরে ঘুরে দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ। বাদামতলা মসজিদের সামনে অনেক ফকির, মিশকিন। মসজিদের চত্বরে রোদ্দুর লুটিয়ে পড়েছে। মাটি থেকে উঠে আসা মিনারের গায়ে রোদের ফুলকারি।

রান্নাঘর থেকে নারকেল দুধ ফুটে ওঠার গন্ধ ভেসে আসছিল। ঐ দুধে আতপ চাল দিয়ে পায়েস হবে। তার সঙ্গে চিনি। এই পায়েসের স্বাদ খুব সুন্দর।

ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল তার মা ফেণিবিবি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আমার মা, বড়মা, চাচিমা, দাদি—সবাই প্রতি চাঁদে উপোস করে—রোজা রাখে। প্রত্যেক মাসে একদিন রোজা। দাদি আমায় বলেছে, বদরের যুদ্ধে দুশমনের পাথরের ঘায়ে দাঁত উপড়ে গেছিল নবিজির। তিনি আটা আর গুড় গুলে খেয়েছিলেন। সেই শোক স্মরণ করে সবেবরাত। বাড়িতে কব্বরখানায় রাতে চিরাগ জ্বলবে। মোমবাতি।

খানিকটা রুটি-হালুয়া নিয়ে বাশার মাকে দিয়ে আসতে বলল জোবেদান-বিবি। ইউসুফ গামছায় রুটি হালুয়া বেঁধে বোড়ালের দিকে যাওয়ার সেই রাস্তায় একা হেঁটে যাচ্ছিল। তারপর সেই আশফল গাছের ছায়া পেরিয়ে, চালতাতলার পাশ দিয়ে বাশার মা-র ঘরের সামনে পোঁছে ইউসুফ একটু জোরেই ডেকে ওঠে—বাশার মা, ও বাশার মা। একবার, দুবার।

একটু থেমে তৃতীয় ও চতুর্থবারও।

গাছের ডালপাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে তেমনই সরসর শব্দ ওঠে। অনেকটা দূর অব্দি ছড়ানো ঘন সবুজের ভেতর এই যে একপাশে সামান্য হেলানো কুড়েঘরটি, তাও কেমন যেন চুপচাপ। শুধু তার খড়ের

চাল, চালে শুধু তো খড়ই নেই—কত কি আছে, তার ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া দুটি কাঠবেড়ালি—ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল।

ও বাশার মা! বাশার মা! ইউসুফ এবার একটু জোরেই ডাকল।

আর তখনই লাঠির ওপর ভর দেয়া রঙিন শাড়ি জড়ানো সেই বুড়ি, আহা, এচুপ এয়েচিস বাপ! আমার মাতার চুলির সমান তোর হায়াৎ হোক—বলতে বলতে দরমার আগড় ঠেলে সামনে ভেসে উঠল।

বুড়ির ফোকলা মাড়িতে খুশির আলো।

এই নাও তোমার রুটি-হালুয়া—ইউসুফ তাড়াতাড়ি ঝাড়া হাত-পা হতে চাইছিল।

আহা—গওহরের নাতি। আয় বাপ, আয়। বাশার মা ডাকছিল ইউসুফকে।

না গো, আমার তাড়া আছে—ইউসুফ চলে যেতে চাইছিল।

পাকা চুলের বাশার মা এই সকালেও যেন-বা প্রেতিনী। তার খোলা, চিরুনি না দেয়া পাকা চুলে রোদ পড়েছিল। লাঠির ওপর ভর দিয়ে সামনে অল্প ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল বাশার মা।

আহা, আমার গওহরের নাতি! রোজ আমার জন্যি নিয়ম করি খ্যাতের মুনিষ দে ভাত পেটিয়ে দ্যায় গওহর।

বাশার মা বুড়ি আমার দাদা গওহর আলি সর্দারের গুণ গাইছে, ইউসুফ মনে মনে বলল।

আয় না বাপ, ঘরে আয়। এট্টুস বোস। পানি খা। বাশার মা ইউসুফকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল।

না গো বাশার মা, আমার কাজ আছে। বলতে বলতে পায়ে পায়ে ইউসুফের পেছিয়ে আসা।

জোবেদানের পাঠানো চালের আটার রুটি আর হালুয়া খুব যত্ন করে আঁচলের এক কোণে বেঁধে নিচ্ছিল বাশার মা।

আশেপাশে তেমন জোরে হাওয়া নেই। সূর্য নিজের নিয়মে গরম পেঁছে দিচ্ছিল পৃথিবীর গায়ে। ঘামতে ঘামতে ইউসুফ বলল, আমি যাই। এটুকু বলেই আকন্দ গাছ, ফুল-ফল পাতাঅলা ধুতরো গাছ, ঘেঁটুর জঙ্গল আর জার্মান লতার ঝোপ পেরিয়ে, আশফল আর চালতা গাছ পেছনে ফেলে মাটির তৈরি পায়ে চলা রাস্তায় নেমে আসতে পারে। রাস্তার ধারে সবুজ ছোট পুরু পাতার ভেতর হেসে ওঠা নয়নতারা ফুল। তার এই রূপমাধুরী

এই রোদে তেমন করে টের পেলনা ইউসুফ। শুধু চোখের বাইরে দিয়ে যেখানে দৃষ্টি পৌঁছয়নি, এমন ঘাসজমি বুকে হেঁটে হেঁটে পার হয়ে গেল একটি মাঝারি চন্দ্রবোড়া। ইউসুফ জানতেও পারল না। দূরে, সেই বাজপড়া তালগাছের ন্যাড়া মাথায় তখন রূপবান কাঠঠোকরা কাঠ কেটে যাচ্ছিল—খট্ খটাস খট্। আর এই সমস্ত প্রকৃতির ভেতর একলা বাশার মা দাঁড়িয়ে। হাতে লাঠি, শরীর সামনে অল্প ঝুঁকে পড়া।

বাদামতলা থেকে বাঁশদ্রোণী ঘাট যেতে গেলে সেই প্রায় হাঁটু ধুলোর রাস্তা ভাঙতে হবে। কুমোরপুকুরের কাছে, বিশাল চালতা গাছের কাছাকাছি সামান্য পানি হলেই কাদা জমে যায়। মইন আলিসর্দার আর শোভান আলি গাজি খালি পায়ে, খানিকটা করে লুঙ্গি গুটিয়ে নিয়ে পথ হাঁটছিল। এখন সকাল দশটা প্রায়। সূর্য বুঝি বা হাজার চোখে আগুন ছড়াচ্ছে। পায়ে পায়ে ধুলো ওড়ার অবস্থা নেই। চলতে চলতে শোভান তার বন্ধুকে বলে উঠল, ও মইন, ছাতা খাটাও।

বন্ধুর অনুরোধে বগলে রাখা বাঁশের বাঁটের ছাতা খুলে মাথায় মেলে ধরল মইন। ছাতা খুলতে গিয়ে তার মনে হলো কলটায় কোথায় যেন আটকাচ্ছে। বাঁশের গাঁট ফুলে কল টাইট হলো, না কি জং পড়েছে মইন বুঝতে পারল না। একটা বাচ্চা আরশোলা ছাতা খুলতেই বাঁট বেয়ে নিচে নেমে এলো।

বাঁশদ্রোণী সাধারণের জিভে অনেক সময়ই বাঁশধানী। এপার থেকে ওপারে বাজারে যেতে গেলে দু পয়সার খেয়া পেরতে হবে। যেতে দু পয়সা, আসতে দু পয়সা—চার পয়সা, মানে ছ নয়া। দুজনের ছয় ছয়, বারো নয়া পয়সা। হীরেনলাল সরকারের জমা নেয়া এই ঘাট। মইন জানে। শোভান জানে।

মাছের টিপ যাই বল গড়িয়ার হাটে রায়নগর পেরিয়ে বন্ধুর ছাতার তলা থেকে আর একটু সরে শোভান বলল।

আকাশে কোত্থেকে যেন হালকা মতো একখানা মেঘ উড়ে এসেছে, তার ঢাকনির নিচে রোদ কিছুটা চেপে গেছে।

সে আর আজ পাচ্ছি কোথায় জুম্মায় হাট বসে। তার এখন তিন দিন দেরি। বলতে বলতে মইন আলি চলার গতি বাড়াল।

শুক্রবার শুক্রবার হাট বসে গড়িয়ায়। সেখানে মুরগি, হাঁস, আণ্ডা, কবুতর, কচ্ছপ, খাসি—কত কি !

সর্বাঙ্গ, গুড়, খাবার, রেডিমেড শার্ট মেলাই জিনিস। আর এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাঁশধানী ঘাট পেঁাছে গেলে তারা নদীর ওপর ধীরে ভেসে যাওয়া খড়ের নৌকো, টালির নৌকো দেখতে পায়। দু একজন পরনের কাপড় বা লুঙ্গিখানা খুলে গামছা পরে খালি পায়ে জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠছিল।

স্রোতে এখন তেমন টান নেই। জলও কোমর সমান বড় জোর। এভাবে খালপাড় হওয়া কেউ কেউ ওপারে উঠে আবার লুঙ্গি নয়ত ধুতি গুছিয়ে পরে ফেলছিল। ফেরার সময়ও তাই করবে।

মইনের বড্ড লজ্জা করল এভাবে দু পয়সা বাঁচাতে। তারা দুই বন্ধু দুই দুই চার পয়সা দিয়ে খাল পেরিয়ে এপারে। রোদে চারপাশ পুড়ে যাচ্ছে। এপারে এসে রাস্তা পেরিয়ে বাজারে ঢুকে তারা একটি দোকানের সামনে দাঁড়ায়।

বাঁশের চ্যাটালো ঝুড়ির ভেতর শাদাটে পিঁপড়ের ডিম। ঝুড়ির গায়ে জ্যান্ত পিঁপড়ে। ওজন দরে পিঁপড়ের ডিম কিনে নিল দুই বন্ধু। তারপর মুদি-মশলা আর দশকর্মার দোকান থেকে একাঙ্কী, ঘোড়াবাজ, তিল, তিসি, মেথি। বাড়ি ফিরে জোবেদান বিবিকে তিল, তিসি, একাঙ্কী, ঘোড়াবাজ, মেথি বুঝিয়ে দিচ্ছিল মইন আলিসর্দার। শুকনো খোলায় নাড়াচাড়া করতে করতে ভেজে নিতে হবে।

জোবেদানের হাতে চার তৈরির নানা সরঞ্জাম বুঝিয়ে দিয়ে মইন পড়ল ছিপ নিয়ে। একটু দেখেশুনে নেয়া আর কি ! একটু পরেই এবাড়ির বাতাস ম ম করে উঠেছিল চার তৈরির গন্ধে। সুঘ্রাণ ভাসছিল বাতাসে। লোহার চাটুর ওপর উনোনের ঢিমে আঁচে চারের মশলা ভাজা হয়ে গেলে হামানদিস্তায় তাকে গুঁড়োতে বসল মইন। ঠং ঠনা ঢন ঢন, ঠং ঠনা ঢন ঢন—বাতাসে শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে কারোর ওপরই তার তেমন ভরসা নেই। চারের মশলা পিষতে পিষতে মইনের মনে পড়ছিল মৃগেল মাছ গাঁথতে দরকার শাদা কেঁচোর টোপ। তার সঙ্গে বাসি পাউরুটি, মাখন দিয়ে। তার সঙ্গে খানিকটা চোলাই মদ, জমে গেল।

মইন নিজের মনেই খুশি হয়ে উঠছিল। চারের গন্ধ তার নাকে যেতেই তার মনে হলো—এভাবে মাছ ডেকে নিয়ে এসে ধরা, তারপর তা রান্না করে

খাওয়া হারাম। রুই মাছেও পাউরুটি-মাখনের টোপ, মেখে নিতে হবে. সব মইনের মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর কাতলা? তার জন্যে খেজমত অনেক। সুগন্ধি, ফাইন চাল ফুটিয়ে, সেই ভাতে লেই বানিয়ে ফেলা। তার সঙ্গে সামান্য পচা নারকেল-দুধ মেশান। অল্প এলাচ গুঁড়ো. তবে না কাতলা খাবে। পাউরুটিকে মাখন দিয়ে চটকে মেখে, তা দিয়ে কাতলার টোপও হবে। তবে এমন তাবে মাখতে হবে যেন খিঁচ না থাকে।

এ সবই দিনের পর দিন করতে করতে মইন আলি সর্দারের মুখস্ত। তবু ঝালিয়ে নিতে হয় বার বার। নতুন নতুন ছেলেরা আসে শিখতে। মইন তাদের কাছে বলতে পারে টিপ—টোপের কথা। টিপলি—ফাতনার কথা। তালা-হুইলের কথা। আরও অনেক খবর। কেমন করে জলতলে ফুট কাটে মাছ. আর ফুট তোলা দেখে বোঝা যায় মৃগেল, রুই না কাতলা এসেছে। মশলা পেশাই করার পর তিন / চারদিন রোদ খাওয়াতে হবে। তারপর মাখনের গাদ দিয়ে তাকে মেখে—ভাবতে ভাবতে মইন হামানদিস্তায় মশলা গুঁড়নোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এর সঙ্গে চার/পাঁচ আউন্স বিলিতি মদ মিশিয়ে নিতে পারলেই—মইনের হাতে হামানদিস্তা শব্দ করে উঠছিল।

মইনের মনে পড়ল ভালো পাউরুটি, বিলিতি মদ—সব ধর্মতলা থেকে আনতে হবে। তরিবত ঠিক মতো না হলে মাছ চারে ভিড়বে না। টোপ ছোঁবে না।

আমরা কাতলার টোপে এলাচ গুঁড়োও দি। কই মাছের টিপ দারুণ জমে পিঁপড়ের ডিমে, মইনের হাত চলছিল। চারের মশলা গুঁড়িয়ে মিহি হয়ে যাচ্ছিল হামানদিস্তার চাপে।

আষাঢ়, শ্রাবণ. ভাদ্র--এই তো তিন মাস মাছ ধরার সিজন। মাছ এসময়ে ডিম ছাড়ে। তার পেটে তখন দারুণ খিদে। চার ছড়িয়ে টোপ নিয়ে বসলেই হলো। আবার আশ্বিন, কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ—তখন তো মাছের অফ সিজন। হাতের হামানদিস্তায় চারের মশলা গুঁড়োতে গুঁড়োতে মইন দেখতে পেল বাইরে বৃষ্টি ধরে আসছে। সেই থম ধরে থাকা পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল মইন। হাওয়ায় গরম আছে। বৃষ্টি হলেও গরম কমে না। মশলা পেষার পরিশ্রমে মইন ঘেমে উঠছিল। তার দু নাকে তখন অবিরাম শুধুই চারের সুঘ্রাণ পেঁছে যাচ্ছিল।

সাত

খুব সকালে জোবেদার বিবির চিৎকারে গোটা বাড়ি জেগে উঠেছে। ফজরের আজান হয়ে গেছে একটু আগে। মেঘলা আকাশে তেমন আলো নেই। বেলা বোঝা যায় না।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ইউসুফ আবছা আবছা শুনতে পাচ্ছিল লাফা এসেছে। লাফা।

মুরগির গোইল—এখানে হাঁস-মুরগির খোঁয়াড়কে এরকম বলা হয়—খুলে মুরগি নিয়ে গেছে লাফা। কেউ টের পায়নি। মুরগিরা ডাকাডাকি, ডানা ঝটপট কিছুই করেনি। বড় একখানা পাথর দিয়ে আটকানো খোঁয়াড়ের দরজা লাফা বড় অনায়াসেই খুলে ফেলে। বেরালের থেকে লম্বায় একটু বড় এই প্রাণীটি বড়ই চতুর। আসেও হালকা পায়ে। গায়ের রং কেমন যেন ছাই ছাই। মুখটা বড়। কদিন আগে মোতালেবদের দলিজ থেকে গোলা পায়রা ধরে নিয়ে গেছিল। তা নিয়ে তেমন হইচই হয়নি। সে পায়রা তো কারোর পোষা নয়।

দলিজের এবড়ো খেবড়ো মেঝের ওপর দু-একটা ধুসর পালক। কালচে হয়ে যাওয়া রক্ত-ফোঁটার চার পাশে গোল হয়ে বসে যাওয়া লাল পিঁপড়েরা। লাফা রাতেই পালিয়েছে পায়রা নিয়ে। নিঃশব্দে উঠে এসেছে ওপরে, দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো দিয়ে রাখা কাঠ বেয়ে। তারপর থামের পাশে পায়রার সংসারে নিঃশব্দ মৃত্যু।

লাফার চেহারা ভালো করে কখনও দেখতে পায়নি ইউসুফ। অন্ধকারে, সন্ধের মুখে বাড়ির পেছন দিয়ে হটাৎ হঠাৎ। নয় তো সার গাদার আড়ালে চুপি পায়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঝপ করে হাঁস-মুরগি তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সেই সব পাখিদের গলায় বাঁচার তাড়না। সংখ্যায় একটি দুটি কমে যাওয়া। গেরস্থের সর্বনাশ।

বিছানা ছেড়ে বাইরে আসার আগে ইউসুফ দাদির গলায় ভেঙে পরা কান্না শুনতে পায়। তার সঙ্গে গালাগালি। খুবই কাঁচা খিস্তি সে সব। আর ইউসুফ ঘরের থেকে বেরিয়ে মাটির উঁচু, নিকোনো আঙিনায় দাঁড়িয়ে মেঘলা উঠোনের যতটুকু দেখতে পাচ্ছিল সেখানে দাঁড়ান দাদি। দাদিকে ঘিরে

মা, চাচি-মা, বড়বুবু, ছোটবুবু। ইউসুফের ঠিক ডান দিকে চালের বাতা থেকে ঝোলানো দড়ির দোলায় কাঁথা চাপা দেয়া ছোট ভাই ইদ্রিস। সেই কাঁথায় ফুল, পাখি, চাঁদ, তারা। ইদ্রিসের মাথার কাছে কাঠের নোলা। লাল রঙের। কাঁদলে নোলাটি হাতে ধরালে কচি বাচ্চা চুপ করে যায়। নোলাকাঠি চোষে। নোলার পাশে একটা পেতলের কাজললতা। তার মাথাটি কবে যেন পড়ে গিয়ে ভেঙেছে। সে কাজল লতা কি আজকের। এই কাজললতার ঘি-কর্পূরের কাজল পরে ছেলেরা জোয়ান হয়ে গেছে।

ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল তার দাদিকে ঘিরে বাড়ির মেয়েরা। দাদির গলায় যেন বা কোনো প্রাচীন শোক-গান। মুরগিটি ওচোল ভর্তি ডিম দিচ্ছিল। পর পর। এই ডিম বসিয়ে বাচ্চাও তোলা যেত। খাওয়া যায়। আর এই সব নারীদের কিছু নিজস্ব রোজগার, মুরগি-মোরগ, হাঁস, ছাগল থেকে। সেই অর্থটুকুই তার স্বাধীনতা। আমার মোরগটা নেয়নি তো, মুরগি দুটো দাদি আমায় হাতে করে যে তিনটে দিয়েছ? ইউসুফ জানতে চাইছিল।

জোবেদান তার মুরগির গুণপনা, সতীত্ব ইত্যাদি বর্ণনা করে যাচ্ছিল টেনে টেনে, ইনিয়ে বিনিয়ে। মোরগ-সংসর্গের ব্যাপারেও জোবেদানের এই প্রিয় কালো মুরগিটির যথেষ্ট বাছ-বিচার ছিল—তা বারে বারে ফুটে উঠছিল এ বিলাপে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে দেয়ালা করে যাচ্ছিল ইদ্রিস। এখন তাকে দোল দিয়ে দিয়ে গান শোনাবার কেউ নেই। একটা মোটা, লম্বা ডাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়েছিল ইউসুফ! উঠোনের এক কোণে এখনও দুটো গোরু বাঁধা রয়েছে। বাকি চারটে গোয়ালে। তাদের নিয়ে মাঠে যাওয়ার জন্যে ইউসুফকে তাড়া দেয়ার কেউ নেই। সামনে মাটির গামলায় কালকে ফেলা বাসি আনাজের খোসা।

লাফা যেভাবে পা দিয়ে মুরগির গোইলের সামনে থেকে ভারি পাথরটি সরিয়েছে, দাদি তা সকলকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছিল। সন্ত্রস্ত মোরগ-মুরগি এদিক ওদিক ঘুরছিল -ঐ মানুষদেরই চারপাশে। বেশি দূরে যাচ্ছিল না। এমন কি লাল ঝুঁটিওলা শাদা রঙের ঐ যে বড় মোরগটি, যার তাগড়া চেহারা দেখলেই স্বাদু মাংসের কথা মনে পড়ে, সেও যেন বাং দিতে ভুলে গেছে। এর মধ্যেই ইউসুফ তার মুরগি দুটো আর মোরগ দেখে নিশ্চিন্ত হলো।

দোলনায় শোওয়া ইদ্রিস ঘুমের ভেতরই দেয়ালা করতে করতে ঠোঁট ফুলিয়ে নিচ্ছিল। তারপর আপন মনে হাসি। হাসি।

কেরোসিন তেলের টিন মাথায় নিয়ে আসা সেই হিন্দুস্থানি ছোকরাটি প্রথমে উঠোনে এত ভিড় দেখে থমকায়। তারপর নিজের ওপর পাটির দুটো দাঁতে সোনার ফুটকির উজ্জ্বলতাটুকু দেখিয়ে হেসে ওঠার চেষ্টা করেই মিইয়ে যায়। সে বুঝতে পারে কোনো কারণে জোবেদানবিবি গুস্যায় আছে, তাই আর দাঁড়ায় না।

উঠোনে নেমে সকলকে দেখার চেষ্টা করে ইউসুফ। আবছা মতো রোদ নেমে এসেছে আকাশ ঢেকে মাটিতে। নিম দাঁতনে দাঁত জিভ পরিষ্কার করে নিয়ে পানিতে কুল্লি করা। তারপর নাস্তা। ইউসুফ জানে মাটির হাঁড়িতে পান্তা আছে। তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা পেয়াজ! এক খাবলা নুন। কিন্তু নাস্তার কথা এখন কে বলবে। সবাই সেই ডিম দেয়া কালো মুরগির শোকে ব্যস্ত। দাদিকে কোনো কথা বলা যাবে না। মা দিতে পারবে না। চাচিমা না। তাহলে আমি কি খাব। ইউসুফ ভাবছিল। খিদেয় আমার চোখে জল।

দোলায় শোওয়া ইদ্রিস ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠছিল। তাকে দোলাবার কেউ নেই

দোলনার কাছে এগিয়ে এসে ইউসুফ তার নিজের ছোট ভাইটিকে দেখতে পাচ্ছিল। দু চোখে ধ্যাবড়ানো কাজল রেখা, কপালে কাজল টিপ। একটু দুলিয়ে দিলেই ভাই চুপ করে যাবে, এমন ভাবনার ভেতর ইউসুফ দোলায় হালকা হাতে টান দিল দোলনা দোলে। খোকা ঘুমোয়। তার মাথার কাছে কাঠের লাল সোনাকাঠি! মাথা ভাঙা পেতলের কাজলতা।

আর কখন যেন সেই দোলা দেওয়ার সুরে সুরে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ইউসুফের চোখে নেমে আসে ঘুম। আকাশে তেমন রোদ নেই, কিন্তু চারপাশ উত্তাপে কেমন যেন ভেপসে আছে। গরম তাপ উঠছে মাটি থেকে। আকাশ আঁশ ছাড়ানো মাছের ছাইমাখা পিঠ। কোথাও এত টুকুন হাওয়া নেই। হয়ত বৃষ্টি নামবে।

দোলায় দোল দিতে দিতে ইউসুফ বসে পড়েছিল। দেয়ালে পিঠ ঠেসান। দু পা লম্বা করে ছড়িয়ে দেয়া তার দু চোখ বুজে গেছিল। হাত থেমে গেছিল। আর তারপরই হালকা ঘুমের ভেতর তলিয়ে গিয়ে ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল আমাদের বাড়ির উঠোনে একটা লাফা। দুটো লাফা। তিনটে।

বেড়ালের থেকে একটু বড় মাথা। লম্বায়ও বড় বেড়ালের চাইতে। গায়ের রঙ ছাই ছাই। চতুর পায়ে মুরগির গোলই খুলে ফেলছে। পাথর সরাচ্ছে। এবার মুরগি ধরবে।

ইউসুফের বাঁ মুখে খানিকটা চকিত মেঘলা ভাঙা আলো এসে পড়েছিল। গালের এক পাশে কষ বেয়ে লালার নদী। সেখানে ডুমো মতো একটা মাছি, বার বার উড়ে এসে বসছিল। ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল তার সামনে লাফ দিয়ে, খাবার নথ ফোলান লাফা, তাঁর হেঁড়েল, রক্তমাখা মুখে একটি ঘাড়ভাঙা মুরগি। ডানাটি লটকে পড়েছে একপাশে। চোখ উল্টে গেছে, বোজা। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে মেঝেয়। লাফা পালাচ্ছে।

কয়েক ঘণ্টা আগেই দাদি আমায় সোনাভানের গল্প শোনাচ্ছিল। সত্তর মণ দুধে জলপান সোনাভানের। ও সোনাভান - আমি দাদির পাশে শুয়ে। দাদির ঠোঁট নাড়া দেখা যায় না অন্ধকারে। ও সোনাভান, সোনাভান গো— তার গায়ের ওপর দিয়ে মুরগি মুখে ছুটে যাওয়া লাফা। ভয়ে—ঘামমাখা ইউসুফের চটকা ভেঙে যাওয়ার মুখে শুনতে পেল বড়বুবু জুবেদার গলা— চাল-কড়াই ভাজা খাবি ?

আর তখনই, কোন অতল ঘোর থেকে জেগে ওঠা ইউসুফ, পেটের অনেক গভীরে তলিয়ে প্রায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া খিদের সন্ধান পেয়ে, চোখ খুলে সামনে বড়বুবুকে দেখে হাতের উল্টো পিঠে কষের পাশে গড়িয়ে নামা লালা মুছে নিয়ে শাদা কলাই করা বাটির ভেতর চাল-কড়াই ভাজা দেখতে পেয়ে যায়। তখনই তার খিদে মনে পড়ে। হাত উঠে আসে। চাল-কড়াই মুঠো করা হাত যায় মুখে। জিভে লালায় দাঁতে চাল-কড়াই ভাজা পিষে জড়িয়ে নিতে নিতে পেটের ভেতর খিদেকে আবার নতুন করে বুঝতে পারে ইউসুফ।

উঠোনে মা-মুরগি তেমনই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ডানার নিচে ছানারা। আরও খানিকটা দূরে গোটা দুই তাগড়া মোরগ। তার মধ্যে আমারটাও আছে। ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল। আর ইদানীং ও আমার হাতের থেকে খুদ খেয়ে যায়। ময়ূর হয়ে ডানা নেড়ে নেড়ে আসে! মাথায় ঝোলানো লাল ঝুঁটি।

আমি এখন চালভাজা নিয়ে ডাকলেও ও আসবে! ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল উঠোনে তেমনই গোরু বাঁধা। দাদি রান্না ঘরে। মা উঠোনে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা মাটির উনোনে কি একটা তৈরি করছে। রান্নার কোনো একটা পদ হবে। শুকনো বেগুন পালা, ক্যাকচা, ঢ্যাড়শের ডাল— সবই এখন

জ্বালানি। ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে আগুন উঠছে। ডালপালা পোড়া ধোঁয়ার খানিকটা কালি উনোনের গায়েও, বাইরে। মায়ের মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই। রোদ পড়ছে সারা গায়ে মাথায়। মাথায় বেগুনি শাড়ির ঘোমটা টানা। মাঝে মাঝে আগুন কমে এলে মা ফুঁক দিচ্ছে। ধোঁয়ায় মায়ের চোখ লাল। সেই লালচে চোখে জলরেখা।

দুটো কাক উঠোনে মুরগির বাচ্চাদের বিরক্ত করছিল। ছাইগাদা থেকে উড়ে আসা গন্ধ তখনই আটকে যাচ্ছিল বাড়ির বাতাসে। কাক দুটোকে মাঝে মাঝেই তেড়ে যাচ্ছিল মুরগি-মা। আবার কি সব নখে ঠোঁটে খোঁটাখুঁটি করে তুলে তুলে খাচ্ছিল। গোইলে গোরু হামলাচ্ছে। একটা বড় ঝুড়ি পড়ে আছে উঠোনে। তার নিচে মুরগির বাচ্চা নেই। জাবনা মাথার মাটির গামলা—তাও একটা উঠোনের ওপরেই। তাই। তার ভেতর গত দিনের তরকারির খোসা, ফেন। সেখানে মাটির নড়াচড়া।

ইদ্রিসের দোলা এখন খালি। তাকে কোলে নিয়েছে নাসিমাবুবু। এসব দেখতে দেখতে চাল-ছোলা ভাজা চিবিয়ে নিতে নিতে খিদের ওপর প্রলেপ দিচ্ছিল ইউসুফ। কোথাও কোন শব্দ নেই। বাতাসও বয় না। গা দিয়ে বুঝি সব পানি বেরিয়ে এল। ইউসুফ তার সামনে উঁচু দাওয়ার ওপর হাতে-বোনা দোলনার ছায়াটি দেখতে পাচ্ছিল। বাইরে ততক্ষণে রোদ হেসেছে। সে রোদে বড় জ্বালা।

আনসার আলির পুকুরে চার সাজিয়ে বসেছে মইন। তার দুটো হুইল ছিল, পাশাপাশি। ওপাশে শোভান আলি গাজি। মাথার ওপর ছাতা। একটু আগেই এক পশলা হয়ে গেছে। বাতাস ভিজে। তবু রোদ উঠে এলে বড় সহজেই চাব পাশ পুড়ে যেতে থাকে। পিঠ, মাথা বাঁচানো দায়।

মইন আলি সর্দারের টিপলি—ফাতনার মাথায় একটা নীল ফড়িঙ বারে বারে এসে বসছিল। এদিক ওদিক দু একটা ফুট, ছোট খাটো ঘাই দেখতে পাচ্ছিল মইন। আশা—চারে মাছ পড়েছে।

আনসার আলির পুকুরের পাশে পাশে জলের ভেতর বাঁশ-কাঠ দিয়ে ছোট ছোট মাচা করা। সেখানে পাশ কেটে লোক বসবে। সারাদিনের পাশ তিন টাকা। এরকমই একটা টং-এ শোভান আলি গাজি। তার পাশে মইন আলি সর্দার।

এর থেকে অনেক ভালো পাড়ার পুকুরে পিঁপড়ের ডিম দিয়ে রুই মাছ ধরা। শোভান মনে মনে ভাবছিল। তার গায়ের গেঞ্জি ঘামে ভিজে উঠেছে।

লুঙ্গিও ঘামে ঘাম। গোটা তিনেক লালচে ফড়িং দুজনের ফাতনাতেই উড়ে উড়ে নিজেদের ভেতর জায়গা বদল করে দিচ্ছিল।

এতটুকুন বাতাস নি। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলছিল মইন। তার গেঞ্জিতেও ঘামের জল ছাপ। দূরে সারি দেওয়া তাল গাছ। আশফল, করমচা, আতা গাছ, বিলিতি গাবও একটা। দেশি গাব গোটা দুই।

এই গাব গাছর ডালেই গেল রোজার ঈদের আগে গলায় দড়ি দিল ঝড়ু ট্রাম কোম্পানির মোটা তার ডালে বেঁধে।

ঝড়ু ডাল ভেঙে নিচে। দেহে প্রাণ নেই। ট্রাম লাইনের অত মোটা তার অর্ধেক গাছের ডালে। অর্ধেক নিচে, ঝড়ুর গার সঙ্গে বাঁধা। মইনের গা ছম ছম করে উঠছিল। দূরে সেই দেশি গাবগাছের একটি। যার ডালে ট্রামের তার বেঁধে—ঝড়ুর জিভ অনেকখানি বেরিয়ে এসেছিল। মুখের কষে রক্ত। এসব একা একা ভাবলে ভয় ভয় তো আসেই। আরও আতঙ্ক ঘেরে, যখন কেউ কেউ এমন জিজ্ঞাসাও উসকে দেয়, অত উঁচুতে ট্রামের তার কেমন করে বাঁধল ঝড়ু! ঝড়ুই বাঁধল, না কি আর কেউ! দুরে আবারও মাছে ঘাই দিল।

সেই তালগাছের সারির নিচে কালিপুজোর রাতে পাঁচু পিশাচসিদ্ধ হতে গিয়েছিল। সঙ্গে বসিরুদ্দি। নাজির শেখ। ফাঁকা মাঠের ভেতর গোবর নিকিয়ে খানিকটা জায়গা সাফসুতরো করে রেখেছিল পাঁচু। বসিরুদ্দি তাকে পিশাচ বশ করা শেখাবে। নতুন মাটির হাঁড়ি। প্রদীপ, ধূপ, নতুন গামছা। এক বোতল দেশি মদ। জ্যান্ত শোলমাছ একটা। সিঁদুর, জবা ফুল, অপরাজিতা—যত সব বুতপরস্তি-না-জায়েজ কাজ কিন্তু বসিরুদ্দিকে বোঝাবে কে? সে এ অঞ্চলের একজন নাম করা ওঝা।

বসিরুদ্দি এসব জিনিসপত্তর গোবরল্যাপা জায়গায় সাজিয়ে পাঁচুকে বলল, তুই একটু বোস। আমরা কবরডাঙা থেকে একটা ওষুদ গাছ তুলে আনি।

সন্ধ্যে নেমে গেছে। চারপাশে কোনো আলো নেই। যেদিকে তাকানো যায় ফসলহীন ধু ধু মাঠ। মাথার ওপর তারা ভরা রাতের আকাশ। সেখানে কখনও একটা দুটো আগুনের ফুলকি। পাঁচু ভয় পাচ্ছিল। তার সামনে হাওয়ায় কেঁপে ওঠা প্রদীপ শিখা। কার। আলোয় অন্ধকার বুঝি বা আরও ঘন হয়েছে।

ঘাড় নেড়ে পাঁচু বলল, আচ্ছা।

নাহ্, আজ আর খাবে না—শোভান অধৈর্য হয়ে পড়ছিল।

বোস না, দ্যাক না—মইন তাকে বসাচ্ছিল।

তিনটে টাকাই জলে, মাচ নি শালা—

একটু দূরে তখনই বড় মাছের ঘাই দেখা গেল। ও খর্চাড়, তুমি ওইখানে—তবু চারে ভিড়বে না—

মাছকে কেন যে স্ত্রীলিঙ্গ করে ফেলল শোভান, মইন বুঝতে পারল না। তার মনে পড়ল পাঁচু তো সেই কালিপুজোর রাতে অন্ধকারে বসে। পাশে মাটির প্রদীপের কাঁপা আলো। কবরখানায় ওষুধ গাছ তুলতে যাওয়া বসিরুদ্দি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গাছের শিকড়ে টান দিল। তখনই দূরে হোয়া হো, হোয়া হো করে ডেকে উঠল শেয়ালের পাল। মাথার ওপর দিয়ে ডানা ঝাপটে চলে গেল কোনো পাখি।

বসিরুদ্দির হাত কেঁপে গেল। দমকা হাওয়ায় নিভে গেল প্রদীপ। পাঁচু এখন অন্ধকারে।

কবরডাঙা থেকে ওষুধ গাছ তুলতে যাওয়ার আগে বসিরুদ্দি বলেছিল, এই তোকে গন্ডী কেটে দিয়ে গেলাম পাঁচু। এর বাইরে পা বাড়াবি না। পাঁচু ঘাড় নেড়েছিল।

আর এখন এই কু-ব্যাপ অন্ধকারে পাঁচু চার পাশে তাকিয়ে কোনো আলো অথবা জীবন দেখতে পেল না। তারপরই সেই তালের সারির কোনো একটির মাথা থেকে এক জোড়া যেন আগুনে গোলা চোখ হাত নিচের দিকে করে—পাঁচু আর তাকাতে পারে নি—বসিরুদ্দি ভাই, গতিক সুবিদের নয়। পেলগে যাও পেলগে যাও—বলে লাফ দিয়ে উঁচু আড়া থেকে নিচে—অনেকখানি নিচুতে জাক দেয়া পাটের গাদার ওপর পড়ে। তারপর সেখান থেকে লাফিয়ে জলে। আর জল পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে—

পরদিন খোলা মাঠে সব ছিল। খালি ধড়ফড়ানো শোল মাছ আর দিশি মদের বোতলটি ছাড়া।

সেই অমাবস্যার আঁধার, তালের সারি, তার একটি থেকে নেমে আসা শীর্ষাসন ভঙ্গির প্রেত—সবটাই এ অঞ্চলে লোক কথা হিসেবে মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ক্রমে তা পল্লবিত হয়।

জলে আবারও মাছের ঘাই। তবু বঁড়শি ঠোকরানোর নাম নেই। বৃষ্টির পর রোদ, এখনই তো মাছ খাওয়ার সময়। মইন মনে মনে হিসেব করছিল। তবে কি টিপে কোনো গন্ডগোল—ভাবতে ভাবতে তালায় মুগার সুতো গুটিয়ে

এনে মইন বড়শিতে টোপ বদলাল। সিসের তার ঠিক আছে কি না দেখল। ফাতনা ঠিক মতো নেড়ে চেড়ে একটু জায়গা বদলে দিল। তারপর আবারও বঁড়শি জলে দিয়ে, ধ্যানে।

এখানে কি ঝুপি-বঁড়শি—চার-পাঁচটা বঁড়শি একসঙ্গে গেঁথে সাজিয়ে নিয়ে তারপর ফেলা—দিলে কাজ হতো! মইন নিজেকেই নিজে জিগ্যেস করছিল। তার অন্য হুইলটিতে নাইলনের সুতো। সেখানেও মাছের কোনো আক্রমণ নেই।

বসে বসে শোভানের হাই উঠছিল।

মইন চারপাশ দেখে নিতে পারছিল। দূরে দূরে ফুটের মাথায় আরও দু এক জন। তিন টাকার পাশ কেটে এসেছে। সকলেরই প্রায় ঘুমে ঢুলে পড়ার অবস্থা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। তার ছোঁয়ায় কেঁপে উঠছিল ফাতনা।

আর তখনই মাথার ওপর ছাতা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঘ। দূরে, কোথায় কোন এক কোণে এক টুকরো মেঘ ছিল। তা ছড়াতে ছড়াতে কখন যে আকাশের একপাশটা কালো করে ফেলল, মইন বা শোভান টের পায়নি।

শীতল বাতাসে বৃষ্টি এলো, ছুটে ছুটে। তার ছাটে প্রথমটায় তেমন জোর ছিল না। তারপর জোরে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মইন আলি সর্দার মাথার ওপর ছাতা খাটাল। জলের বিন্দু হাতে ঘোরান প্লাস্টিকের লাট্টু যেমন চেহারায়, তেমন করে পুকুরের জলের বুকে বৃষ্টির টুকরো ফুটে উঠেছিল।

মইনের মনে হলো বৃষ্টি সরে গিয়ে রোদ উঠলে নতুন আর এক দফা সুযোগ থাকবে মাছ মারার। এই অঝোর বরিষণে উড়ে আসা বৃষ্টিকণায় দুই বন্ধু ছাতার আড়ালে শরীর ও মাথা বাঁচাতে না পেরে আরও খানিকটা কুঁকড়ে ফুট-এর ওপর নিজেদের জড়সড় করে রেখেছিল। বৃষ্টি তাদের পা পিঠ হাত এমনকি মাথার চুলও ভিজিয়ে দিচ্ছিল।

চারপাশে শাদা পর্দা ঝুলিয়ে বৃষ্টির এই পড়ে যাওয়ার ভেতর তারা দুজন ধীরে ছিপ গুটিয়ে ফেলতে চাইছিল। আর তখনই ডান পাশে উঁচু আড়ার ওপর থেকে ধর শালাকে, মার শালাকে, ছাড়িস না—এমন কোনো টুকরো টুকরো শব্দে সচকিত হয়ে ছাতার আড়াল থেকে চরাচর ঢেকে দেয়া বৃষ্টির আড়াল ভেদ করে দেখতে পায় চার পাঁচটি ছুটে আসা মানুষের সিলুয়েট চেহারা। তাদের একজনের হাতে খ্যাপলা জাল!

এই অন্ধকার পৃথিবীর ক্যানভাসে চার পাঁচটি নয়, পাঁচ জনই—মইন ও

শোভান এখন পরিষ্কার দেখতে পায়, স্পষ্টতর হয় ওদের কণ্ঠস্বর—মার, মার, মার—আর তখনই আকাশ চিরে বাজ পড়ে। আড়ার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ হয়ে ছুটে আসা সাপ পড়ে বেয়ে খুব তাড়াতাড়ি জল ছোঁয়। তারপর গোটা শরীর মাথা ভাসিয়ে পানি কাটতে থাকে। তার শরীর বৃষ্টি ফোঁটা লাগা পুকুরে যেন বা কোনো লাঠি। আর পাড়ে দাঁড়ানো মানুষেরা দুদ্দাড় নেমে এসে প্রায় হাঁটু অব্দি জলে ডুবিয়ে দেয়। একজন খ্যাপলা জাল ছোঁড়ে একটি অন্ধকার বৃত্ত সাপকে বেড় দিয়ে পুকুরে আছড়ে পড়ে। জালবন্দি সাপ ফোঁসে, মোচড়ায়। এ ভুজঙ্গের বড় তেজ। কাল ভুজঙ্গের শরীর মোচড়ানি ল্যাজের ঝাপটায় জল কাঁপে। জাল কাঁপে। আর জালের দড়ি ধরা মানুষটি আর খানিকটা জলে নেমে সেই বিষধরকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

শোভান চিৎকার করে বলে, শালারে ডুবো। ডুবো।

দম ফেটে আসা সরীসৃপ বার বার শরীরে, ল্যাজ ফণা ঝাড়া দিয়ে জলতল থেকে উঠে, মাথা তুলে জালের বাইরে আসতে চায়। দড়িতে ঝটকা লাগে। খালি পায়ের মাঝারি গড়নের মানুষটি তার পেশি ও চোয়ালের দৃঢ়তায় মনে করিয়ে দেয় এবড় কঠিন লড়াই।

উৎসাহী দু'একজন পুকুড় পাড় থেকে ইট কুড়িয়ে ছোঁড়ে। একবার। দুবার।

শালার আল কেউটে হবে—জালের রশি শক্ত মুঠোয় নেয়া মানুষটি তার কথায় যেন ফোঁস ফোঁস করে ওঠে। ক্লান্ত, দম ফেটে যায় অহিরাজ জালের ভেতর ধীরে নেতিয়ে আসে। দড়ি আলগা হয়। স্থির জাল ডুবে যেতে চায়।

তারপর এক সময় জল একেবারে চুপ হয়ে গেলে, বৃষ্টি তো আগেই থেমেছে, জাল গুটিয়ে পাড়ে টেনে এনে তার বাঁধন থেকে সাপটিকে মুক্ত করে দেয়া হলো। নেতানো লম্বা মাংসটি মাটিতে স্থির। তার চকচকে আঁশে জল আর রোদের খেলা। আকাশ আলো করে রোদ্দুর উঠেছে।

এইবার মাছ খাবে—নিজেকেই নিজে শোনায় মইন। নতুন করে টিপ গাঁথ, শোভানকে শোনায় মইন।

দূরে উঁচু আড়ায় সাপের মাথা, গা লক্ষ করে তখন অনেক ইটের টুকরো, লাঠির ঘা নেমে এসেছে। তারপর এক সময় মরেছে—এই সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে মাঠে ভিজে ডালপালা, পাতাপুতি জেবলে তার সৎকারের ব্যবস্থা হতে থাকে, মরা সাপ না কি হাওয়ার ছোঁয়ায় বেঁচে ওঠে, বৃষ্টিপতনের স্পর্শে তার প্রাণ

ফিরে আসতে পারে—এমন সংস্কারে সেই সাপের শরীর ঘিরে আগুন জ্বলে।

লাঠি দিয়ে আগুনের আঁচে সাপের সেই ঝকঝকে, জায়গায় কাদা লাগা থ্যাঁতলানো শরীর পুড়িয়ে নিতে নিতে সেই চার পাঁচ জন সাপতাড়ানো মানুষের কোনো একজন বলে ওঠে, শালার মশা কি! কামড়ে দোগড়া দোগড়া ফুলিয়ে দিল।

আগুনের লালচে হলুদ আর নীল আভা সাপের শরীর গ্রাস করল।

ঠিক তখনই হাতছিপে একটা পুঁটি ধরে ফেলল ইউসুফ। এক ঝোঁক পানির পর এখন এক আকাশ রোদ্দুর। ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল তার কেঁচোর টোপে গেঁথে যাওয়া রুপো রঙের পুঁটিটিকে। ল্যাজে ছোট্ট টিপ—কালো রঙের। ঝটপট ঝটপট করতে করতে রোদ্দুরে বুঝি বা নিজের রং মিশিয়ে দিচ্ছিল সেই মাছ।

সাবধানে বঁড়শি থেকে মাছের ঠোঁট ছাড়াচ্ছিল ইউসুফ। ঠোঁট ছিঁড়ে গেলে এখনই মরবে। একটা কচুপাতায় মাটিমাখা কালো রঙের কেঁচো খানিকটা। একটা টিনের মগে—কৌটো কাটা মগে জলের ভেতর মাছ। দুটো বাটা, একটা কাতলার বাচ্চা, একটা পুঁটি। তার মধ্যে কাতলার বাচ্চা মাঝে মাঝেই পেট উল্টে চিত হয়ে যাচ্ছিল।

ওর জান আর বেশিক্ষণ নি—মনে মনে বলতে পারছিল ইউসুফ।

মোতালেবের হাত ছিপে ততক্ষণে একটা বাটা মাছ উঠে এসেছে। মাছটাকে তুলেই বঁড়শি থেকে তার মুখ ছাড়িয়ে পুকুর পাড়ে শক্ত মাটির ওপর আছাড় মারল মোতালেব একবার দুবার। দু একবার লাফালাফির পর সেই ঝকঝকে রুপোলি শরীর স্থির। আর একটা কচু পাতায় তাকে তুলে গুছিয়ে রাখল! ইউসুফ এমনটি পারে না। নিজেরে হাতে ধরা মাছ খেতেও তার কি রকম যেন ঘেন্না মতন। সব মাছ নিয়ে গিয়ে দাদিকে দেবে! তার আনন্দ শুধু ধরাতেই। মোতালেব এবার কাঁকড়া তুলেছে বঁড়শিতে। আমরা মুসলমানরা কাঁকড়া, কচ্ছপ, চিংড়ি মাছ খাই না। যদিও কাঁকড়া মকরুর—কিন্তু আমরা খাইনা। জল থেকে ওঠা কালচে কাঁকড়া মাটিতে নামিয়ে দিতেই সরু সরু দাঁড়া বেয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। মোতালেব ডানহাতের বুড়ো আঙুলে ওর পেটটা চেপে নিজের হাতে বড় দুটো দাঁড়া ভেঙে দিল। তারপর একবার পুকুরের মাঝখানে। বড় দাঁড়া ভাঙার পর কাঁকড়া বাঁচবে তো! ইউসুফের মনে হচ্ছিল। ততক্ষণে সূর্যের রঙ গোলা আবির হয়ে গিয়ে বিকেল নেমেছে।

আট

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেলে হাতের খুদ নিজের পোষা শাদা মোরগকে খাইয়ে দিতে পারছিল ইউসুফ। ঝুঁটি ফুলিয়ে ডানা নেড়ে নেড়ে হাতে রাখা খুদের আশেপাশে ঘুরছিল মোরগ। একটি দুটি অন্য মুরগিও। তারা সবাই অবশ্য ইউসুফের হাত থেকে খায় না।

মেঘলা দিনের ভোর যেমন হয়, একটু বেলা বাড়লেও তার ফারাক বোঝা যায় না। আজ তেমনই দিন। আর হঠাৎ তার সামনে পাশে মোরগ-মুরগিরা কঁ-কু-কঁ করে চঞ্চল হয়ে উঠলে ইউসুফ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায় বড় বেঁজি একটা মড়মড় করে এবাড়ির উঠোন পেরিয়ে, সামনের মাটির দলিজের দিকে চলে গেল। সাপ দেখলেও দিনের বেলা এরকম শব্দ করে ওঠে মুরগি-মোরগা। চঞ্চল পাখিরা বেজি সরে যেতেই আবার ও খুদে মন দেয়। আর তখনই এবার রোজার ঈদ এসে গেল। ঈদের চাঁদ এগিয়ে এসেছে। যেমন প্রতিবার আসে বলতে বলতে জোবেদান উঠোনের খোলা চুলোটি জ্বেলে দিতে চাইছিল। তার হাতে শুকনো চ্যাড়শ পালা। টেক্কা মার্কা দেশলাই।

আর এভাবেই রমজান মাস শুরু হয়ে যায়। খুব ভোরে, সূর্য ওঠার অনেক আগে চাবি কামান ফোটে বাদামতলা মসজিদে। গোটা অঞ্চল কেঁপে উঠে জেগে গেলে, চুলোয় আঁচ পড়ে।

চাবি কামানের পর 'আপনারা সবাই সেহরি খেয়ে নিন' বলতে বলতে কারা যেন দল বেঁধে এ রাস্তায় ও রাস্তায় হেঁকে যায়। আর একটু আগেই চৌকিদার ঘরে ফিরে গেছে। আকাশে তখনও শুকতারা। গোটা তিনেক উনোনে আগুন দিয়ে আঁচ উঠে গেলে জোবেদান তাড়াতাড়ি ভাত বসায়। ডাল। তরকারি। দুধ জ্বাল হবে। সঙ্গে কলা-বাতাসা।

মইন ডাল তরকারি দিয়ে সেহরি খানা খেলেই সারা দিন অম্বলে পড়বে বুক জ্বলবে। তাই তার জন্যে ভাত-দুধ। পাকা কলা, বাতাসা।

দুধ-ভাত কলা-বাতাসায় মেখে সেহরি খেয়ে নিচ্ছিল ইউসুফ। শাদা কলাই করা বড় বাটি। তার থেকে খাবার তুলে খাচ্ছিল মইন। কাড়ি চিনেমাটির বড় পাত্রে মইন। বুড়ো আঙুলে বাতাসা টিপে টিপে ভাঙছিল।

মা রোজা রাখবে, চাচিমা রাখবে, দাদি, আমার দাদা ইউসুফ, বড়বুবু, ছোটবুবু। আব্বা, আব্বার আব্বা তাকেও তো আমি দাদা ডাকি।

সেহ্‌রি খাওয়া শেষ করুন—কারা যেন আবারও হেঁকে যাচ্ছিল রাস্তায়। পরিষ্কার আকাশের কপালে তখনও জ্বলজ্বলে শুকতারা-টিপ।

এরপর সেহ্‌রি খাওয়া হয়ে গেলে তেমন করে আর কোনো কাজ থাকে না। সারাটা দিন রোজা। পানি গেলার হুকুম নি! এমন কি থুথুও না। এর মধ্যে গোইল থেকে গোরু নিয়ে মাঠে যেতে হয় ইউসুফকে।

ভোরে ফজরের আজান হয়ে যাওয়ার পর চারপাশে জেন, খব্বিশ জেন, গন্নাকাটা, পিশাচ জলার পেত্নি—কিছুই থাকে না। আগুন থেকে পয়দাইস যে জেনের, নানান রূপ ধরতে পারা সেই চিজটি বেশিরভাগ সময়েই সাপ হয়ে সামনে আসে।

দাদি জোবেদান বিবি তার গল্পের মায়ায় নাতি নাতনিদের বেঁধে রেখে দেখাতে পারে কেমন করে মুণ্ডহীন গন্নাকাটা দুহাতে সামনের বাতাস সাঁতরাতে সাঁতরাতে সামনে পড়ে যাওয়া ইনসানের ঘাড়টি ভেঙে দিতে চায়। আর মানুষ না পেলে গাছই সই। মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি পেঁচিয়ে, জাপটে ধরে তাকত দেখায় গন্নাকাটা। অনেকটা সময় ধরে। এমন দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শীও আছে না কি কেউ কেউ। আর জলার পেত্নিরা অনেক সময়েই চুল ছেড়ে, পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। চালতা গাছে। কখনও বা জ্যোৎস্না রাতে গাছে ঠেসান দিয়ে। তা দেখে ঘর ফেরা মানুষের হাত-পা ছেড়ে যায়। গল্প ছড়ায় মুখে মুখে।

ফেরেস্তা আছে আমাদের দু কাঁধে, কেরামিন ডান কাঁধে বাঁ কাঁধে কাতেমিন।

পেসাব ফিরতে হলে বসে করতে হবে। সঙ্গে পানি নয়তো ইটের টুকরো দাদি বলে।

দাদি আরও বলে, এইসব পেত্নিরা কখনও বেরাল হয়ে ঘোরে। চারপাশে চক্কর কাটে। মুখে ম্যাও ম্যাও ডাক। কখনও বা আধ বাঘার চেহারা নিয়ে বড় বড় ভাটা চোখ মেলে একবার খানা এপার আর একবার ওপার করে। জেনের চেয়েও পাজি খব্বিশ জেন। সে আরও জোরে ভয় দেখাতে পারে। ভোরের প্রথম আজান হয়ে গেলে চারপাশের ভূতপ্রেত ফরসা। আজানের শব্দ যতদূর ছড়ায় বাতাসে, ততদূর কোনো জেন, খব্বিশ জেন, জলার পেত্নির গন্নাকাটা কিচ্ছু নি।

মাঠে ছেড়ে দেয়া গোরুদের চড়তে দিয়ে ইউসুফ এসবই ভাবছিল।

আকাশে মেঘ ঘিরেছে। গলার ভেতরটা কারবালা। তবু ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম আসে।

বাদামতলা মসজিদে জোহরের আজান শোনা যাচ্ছিল। গোরুরা ঘাস খেতে খেতে একটু দূরে চলে গেছে। বৃষ্টিতে নরম হয়ে যাওয়া মাটিতে তাদের খুরের চিহ্ন। ঘাসের ডগায় ঘাস রঙের ফড়িং। খুব জোরে লাফিয়ে এখান থেকে ওখানে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল।

পেটের ভেতর খিদের খিবিশ জেন থিতিয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। বাদামতলা মসজিদের দিকে হাঁটছিল রোজা রাখা বিশ্বাসী মানুষ। গোটা রমজান মাস পাঁচ ওয়াক্ত করেন অনেকেই। একখানা মেঘ ছাতার কাপড় হয়ে একটু একটু করে খুলে যাচ্ছিল আকাশে।

তারপর বৃষ্টি এলো। প্রথমে ধীরে, তারপর জোরে। আরও জোরে। খোঁটায় বাঁধা গোরুদের খোঁটা উপড়ে কোনো ছায়ায় নিতে হবে বৃষ্টি মাথায় করে এসবই ভাবছিল ইউসুফ। আর তখনই তার বাশার মা-র কথা মনে পড়ে যায়।

আজ আমার ভাগে দুটো গোরু। দাদা নিয়েছে দুটো। আব্বা দুটো। বড়বুবু ছাগল চড়াবে। বৃষ্টি ভেজা ইউসুফ গোরুদের নিয়ে ভিজতে ভিজতে বাশার মায়ের সেই ঘরের সামনে এসে ডাক দিল—বাশার মা, ও বাশার মা! বাশার মা!

বাইরে কড় কড় করে মেঘ ডেকে উঠছে। আঁধার হয়ে আছে গোটা আকাশের মুখ। তবু বিদ্যুৎ ছোঁয় সেখানে আলো জ্বলে ওঠে। ইউসুফ দেখতে পায় কচু পাতায় জলের ফোঁটা—

ও বাশার মা।

কে বাপ!

এতক্ষণে সাড়া পেয়ে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হয় ইউসুফ।

আমি এচুপ—গওহর আলির নাতি।

কে?

আরে এচুপ, এচুপ—তোমার গওহর আলির নাতি। পানিতে গোরু ভেজা হয়ে গেলাম—ইউসুফ তার নিজস্ব উচ্চারণে এরকমই কিছু বলতে চাইছিল।

আহা! তা বাপ—ভিতরি আয়—বলতে বলতে বাশার মা বাইরে আসে। আর তখনই সমস্ত চারপাশ ঝলসে দিয়ে বাজ পড়ে। সেই ক্ষণ-আলোর রেখায় বুড়ির রঙিন কাপড়, উলিঝুলি একমাথা পাকা পাকা চুল, কোঁচকানো

চামড়া—কোটরে বসা চোখ—এই কি দাদির বলা খব্বিশ জেন—ভেতরে ভেতরে চমকে ওঠে ইউসুফ।

খুব জোর পানি পড়ছে। এবার বর্ষা নেমে গেল। ও বাপ দুদিন ভাত খাইনি। পাটায় নি। বাশার মা বলতে চাইছিল।

ইউসুফের ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, গতিক সুবিদের না—পেলগে চল।

ওবাপ—ভাত আসে না যে ভাত খাইনা ক'দিন। ভাত খাব।

এখন রোজা না—আমতা আমতা করে বলল ইউসুফ।

তাহলে চাল-কড়াই ভাজা পাটাস বাবা দুটি। বড্ড খিদে। বড্ড খিদে—এরকমই কিছু একটা বলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাশার মা। আর তখনই গোরু দুটোর দড়িতে টান দিয়ে ইউসুফের ফিরে আসা। বৃষ্টি তখন একটু ধরে এসেছে। জোরে বৃষ্টি হলে রাস্তার ধুলো কাদা হয়ে যায়। সেই পা ডোবা কাদা পেরিয়ে বাড়ি গেলে আর বেরতে ইচ্ছে করে না। সারা পায়ে কাদা। কাদা ভেঙে ভেঙে পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে শাদা হাজা। বড্ড জ্বলে। কুট কুট করে।

বৃষ্টি ভেজা গোরুর গা থেকে কেমন যেন একটা গন্ধ উড়ে আসে। তার সঙ্গে সার গাদা থেকে ভেসে আসা পচাটে গন্ধ। বাড়ি ফিরে এলে দেখা যায় বৃষ্টিতে মাটির দলিজ-ঘর ভিজে ঝুববুস। গোইলে গোরু তুলে দিতে দিতে ইউসুফের বড্ড ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। উঠোনে পোকা খুঁজে খুঁজে বেড়ায় একটি দুটি দোয়েল।

তারপর একটু একটু করে বিকেল গড়িয়ে গেলে এফতারের আয়োজন। বরফ পানি। কাচের গ্লাসে বরফ দেয়া রঙিন শরবত। ছোলা ভিজিয়ে রেখেছে দাদি। বড় বড় কাবলি ছোলা। শশা আছে। আপেলের টুকরো। বেসনে ভাজা পেঁয়াজের বড়া। আলুর চপ। লালচে, গোলাপি ফুল তোলা কলাই করা বড় থানচায় সাজানো ছোলা ভেজান, তেলেভাজা, শশাকুচি। হাতে হাতে খালি হয়ে যাচ্ছিল। দাদা, আমি, চাচা, আব্বা। সঙ্গে এ বাড়ির সবচেয়ে প্রাচীন মানুষটি—গওহর আলি সর্দার। মা, খাবার গুছিয়ে দিয়েছে। দাদি দিয়েছে। চাচি-মা-ও। হাতে হাতে পরিষ্কার বড় থানচা। পেতলের বড় জগে ভর্তি পানি। সবাই প্রাণ ভরে জল খেয়ে নিচ্ছিল। কতক্ষণ পর তৃষ্ণা মিটল। সবাই

প্রাণ ভরে জল খেল। দূরে সন্ধে নামছে, ধীরে। একটু আগে মগরেবের আজান হয়ে গেছে মসজিদে। তারপর নামাজ। আরও পরে তারাবির নামাজ পড়া হবে। এই সমস্ত রমজান মাস ধরে তারাবি পড়া হবে। হজরত রসূল নিজে তারাবি পড়তেন।

একটা লণ্ঠন রেখে গেছে দাদি। ঘরে তার আলোয় ছায়া জড়িয়ে গেছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। ব্যাঙের ডাক, একটু থেমে থেমে। সঙ্গে ঝিঁঝি পোকা। একটা চিটকেনা—টিকটিকি ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে দেয়াল বেয়ে পোকা ধরার জন্যে আলোতে আসছিল।

হারিকেনের আলোয় পড়ার বই সামনে নিয়ে ঢুলে পড়ছিল ইউসুফ। সারাদিন রোজা রাখার পর শরীর ভাঙা ক্লান্তি দু'চোখের পাতায় আঠা হয়ে আটকে যাচ্ছিল। বাইরে বৃষ্টির শব্দ, জোরে আরও জোরে। ঢুলে পড়ে যাচ্ছিল ইউসুফ।

তাকে তুলে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দিল জোবেদান। বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই ঘুম। ঘুম।

ভোরে আবারও মসজিদে বেজে ওঠা চাবি কামানের শব্দে ঘুম থেকে উঠে, আপনারা সবাই সেহরি খেয়ে নিন, শুনতে শুনতে মেঘ বোঝাই গুমোট আকাশ দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ। তারপর দুধ-কলা-বাতাসা দিয়ে মাখা ভাতে সেহরি খেতে খেতে তার চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। সেহরি-পর্বটুকু চুকে গেলে তার দু চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো।

বিছানায় নিজেকে নিয়ে যেতে যেতে ইউসুফ শুনতে পাচ্ছিল ফজরের আজান কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে মিশে যাচ্ছে। তা শুনতে শুনতে, যেন বা কোনো স্নিগ্ধতার স্পর্শে ইউসুফের ঘুমিয়ে পড়া। বাইরে ততক্ষণে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙলে ইউসুফ আবারও জোবেদানের তর্জন-গর্জন গালি-গালাজ শুনতে পাচ্ছিল।

জোবেদানের কাঁঠাল গাছে ঈদের এফতারির জন্যে একটি কাঁঠাল রাখা ছিল। গাছ পাকা কাঁঠাল ভেঙে নিজের ছেলে নাতি স্বমীর পাতে দেয়ার বড় সাধ ছিল জোবেদানের। সেটি ভালো করে পেটে পুরেছে সড়েল। অত বড় গাছ পাকা কাঁঠাল! জোবেদান রীতিমত চেঁচামেচি করছিল। গাছের নিচে কাঁঠালের কাঁটাঅলা খোসা মুখ থুবড়ে পড়ে। হলদেটে সোনা

রঙের দু এক কোয়া কাদার ওপর। তার গায়ে উড়ে আসা আলগা আলগা নীল মাছি। জোবেদানে চিক্কুর পড়াছিল। গাল দিচ্ছিল। কাঁঠাল ভাঙা সড়েলটির কিন্তু ত্রিসীমানায় দেখা নেই।

সকালটাই শুরু হলো ক্যাচাকেচি দিয়ে। ইউসুফ নিজের মনেই বলছিল। হাওয়ার ছাটে বৃষ্টির ফোঁটারা উড়ে আসছিল। দাওয়ায় দাঁড়ান ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল দূরে, সবুজে বৃষ্টি পড়ছে। গাছের মাথা নাড়ছিল। উঠোনে ভিজছিল গোরু।

আজ সারাদিনটা একটু আরামে যাবে। আকাশ থেকে পানি নেমে আসছে। চারপাশ ঠান্ডা ঠান্ডা। এর জন্যে তেষ্টা কম পাবে — ঘুম ঘুম চোখে হাই তুলতে তুলতে ইউসুফ এসব ভাবছিল। রোজায় থাকলে দুপুরে ঘুম পাবেই। সেই শেষ রাতে উঠে সেহ্‌রি খাওয়া। শরীর ক্লান্ত থাকে। ভাবতে ভাবতে ইউসুফ ঘুমের ভেতর ঢুকে গেল।

তারপর ঘুম ভেঙে উঠে এই মেঘলা পৃথিবীর মধ্যে নিমের দাঁতনে দাঁত দাত মার্জছিল ইউসুফরা। জিব ছুলে নিচ্ছিল। ভালো করে পানিতে কুল্লা করে নিতে হবে। রোজা ভাঙার পর নিম দাঁতনে দাঁত মেজে নেয়া — এমনটি নিয়ম। সেই সুন্নত পালন করছিল ইউসুফ, ইউনুস — এবাড়ির অন্যান্যরা। আজ মসজিদে গিয়ে এফতার করব — ইউনুস ভাবছিল। সেখানে সকলের সঙ্গে পাশাপাশি বসে — বড় খানচা থেকে ছোলা ভেজানো, শশার কুচি, আপেলের টুকরো! বরফ পানি।

জোবেদান ফুল তোলা কলাই করা বড় খানচায় পরোটা, গোসের টুকরো তুলে দিচ্ছিল। ভাজা পরোটা-মাংসের সুঘ্রাণ ভাসছিল বাতাসে। কাঁঠাল তো আর খাওয়াতে পারলাম না, সেতো শয়তান, খবিশ সড়েলে খেল। জামসিন আমের গাছ থেকে আম পাড়িয়ে রেখেছি। আজ তারাবির পর দেব।

জামসিন আমে কোন চোঁচ নেই। দাঁত লাগে না। ইউসুফ জানে, ইউনুস জানে। বাড়িতে গোস্‌-পরোটার এফতার। সঙ্গে ফল আছে। তবু যেন কিসের টানে বাদামতলা মসজিদে যেতে চাইছিল ইউনুস। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে এফতার করব। ইউনুসের ভালো লাগছিল।

নিজের জন্যে পরোটা-গোস ফল রাখতে বলে মসজিদের দিকে দৌড়ল ইউসুফ। বারান্দায় দড়ি দিয়ে বোনা ফাঁকা দোলাটি স্থির। ইদ্রিসকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেছে মা। সন্ধেবেলায় নানান কু-বাতাস বয়, তার থেকে

বাচ্চাকে সরিয়ে রাখা—ফোঁশবিবি মনে মনে ভাবছিল। মসজিদে বড় খানচায় শশা যাচ্ছিল। পাশে বাতাসা। এফতারি পাঠাচ্ছে।

বেশ ভারি এফতার হলো আজ। মনে বলছিল ইউসুফ। তার মনে পড়ল বিকেলে রোজা ভাঙার আগে বটতলায় মকুর আলির মুদিখানার দাদির জন্যে পেঁপের ফুল আনতে গিয়ে তার আজই পেশকারের সঙ্গে দেখা। পেশকার মুড়ি কিনছিল। রোজা ভাঙবে।

ইউসুফের গলা দিয়ে মাংস পরোটার ঢেকুর উঠে এলো।

রোজার মধ্যেও গোরু তেড়ে দেয়া, নেড়ে দেয়া—এসব কাজ থেকেই যায় ইউসুফের। দু এক পশলা বৃষ্টির পর মাঠে ঘাসের নিচে কাদা। সেই ঘাস দাঁতে ছেঁড়ে গোরু। ছিঁড়তে ছিঁড়তে দূরে চলে যেতে থাকে।

খালি পায়ে, খালি গায়ে লুঙ্গি পরা ইউসুফ। তার দু কাঁধে দুই ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেমিনকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। এই ফেরেশতারাই সবাইকে—মোমিন মুসলমানকে বেহশ্তের পথ দেখায়। বসে পেসাব না ফিরলে, পেসাবের সময় পানি না নিলে ফেরেশতারা উড়ে যাবে। তখন আজরাইল, শয়তান ভর করবে তার কাঁধে। এ সব কেসসা দাদির কাছে শুনতে পায় ইউসুফ।

অন্ধকার রাতে জোবেদানের গলার স্বর ঘরের বাতাসে ডুবে যায়। ফিস ফিসে, গাঢ় কণ্ঠে কতকি শোনায় জোবেদান। বলতে থাকে। বলতেই থাকে। কেরামিন আর কাতেমিন এনসানকে ভুল পথে যেতে দেয় না। না পাব কাজ করতে মানা করে। যে বাড়িতে ফেরেশতা নামে না, সে বাড়িতে গজব নেমে আসে আল্লাতালার। সেই অভিশাপে ছারখার হয়ে যেতে চায় সব কিছু।

বাড়িতে কুকুর থাকলে ফেরেশতারা আসে না। আর যদি ছবি থাকে ঘরের দেয়ালে, মানুষ কিংবা জীবজন্তুর, তাহলেও নামবে না ফেরেশতারা। তাই ঘরের দেয়ালে মানুষ, জীবজন্তু কারোরই ছবি থাকা উচিত নয়।

জোবেদানের গা থেকে রোজার গন্ধ উঠে আসে। সমস্ত ঈদের মাসে দাদির গা থেকে মায়ের গা থেকে এই গন্ধ পেয়ে থাকে ইউসুফ। সারাদিন রোজা। পানি নেই, খানা নেই—তবু কি খাটানটাই খাটে মা, দাদি। সারাদিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরা। গোরুর গোইলের কাজ, সেহরির খাবার, ঘর পরিষ্কার—ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতর চক্কর দিচ্ছিল ইউসুফের। তার গোরুরা ঘাস

চরতে চরতে দূরে, আরও দূরে চলে যেতে চাইছিল। নরম কাদায় গোরুর পায়ের চাপে ছোট ছোট গর্ত তৈরি হয়ে যায়। বৃষ্টি হলে সেই জায়গাটুকুতে জল জমবে। তার ওপর আস্ত একখানা আশমানের ছায়া। কখনও পাখির ফুটাক। একটা দুটো তিনটে।

জল, আহা পানি—রোজার মধ্যে পানির কথা মনে পড়লে তৃষ্ণা বুঝি বেড়ে ওঠে। তবু পানির কথা এখন ভাবা না থাকি, ইউসুফ চিন্তা করছিল মনে মনে। তেমন হলে পানি মুখের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে কুল্লি করে নাও। হুঁশিয়ার। পেটের ভেতর না পানি চলে যায়। গেলেই রোজা ভাঙা হয়ে যাবে। আর রোজা ভাঙা হলে কাঁধের থেকে উড়ে যাবে কেরামিন, কাতেমিন।

দাদি বলে, রোজ কেয়ামতের দিনে হাসরের ময়দানে শেষ বিচারের আশায় বসে থাকা মানুষজনের সামনে শিঙা বেজে উঠবে। শিঙা বাজাবে ফেরেশতা এসরাফিল। এসরাফিলের কাঁধে এই দুনিয়ার ভার। তবু এসরাফিল শিঙা বাজাবে। বাজাতেই থাকবে। তপ্ত তামা হয়ে উঠবে সমস্ত দুনিয়া। শেষ বিচারের আশায় বসে থাকা মানুষ বলতে থাকবে ইয়া নফসি! ইয়া নফসি! আমার কী হবে! হায় আল্লা, আমার কী হবে!

শুধু নবিজি—হজরত মহম্মদ বলবেন, ইয়া উম্মতি! আমার উম্মতের কি হবে।

ইউসুফ তার গোরুদের ঘাসচরা দেখতে পাচ্ছিল।

বেশি দূরে চলে গেলে গোরুদের হেড়ে আনা যাবে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির তেষ্টা বাড়ছিল। আর তখনই কারবালার কাহিনী—দাদিমার মুখ থেকে শোনা হাসান হোসেন এজিদের কথা মনে পড়ে গেল ইউসুফের।

তেষ্টা পায়। ইউসুফ তার গোরুদের দেখে। ঘাসে মুখ দেয়া গোরুরা আবারও ফিরে আসছে। আকাশে ঝুলে আছে ভারি মেঘ। হয়ত পানি হবে। ঝম ঝম ঝম ঝম।

আমার দু কাঁধে ফেরেশতারা। আমি পানি খাব না। ইউসুফ মনে মনে বলতে থাকে। আজরাইল আমায় না-পাব করতে পারবে না। দাদি আমায় বলেছে, সব সময় ফাঁক খুঁজছে আজরাইল। কীভাবে ইনসানকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া যায়।

গোরুরা আরও কাছে চলে আসছিল ইউসুফের। আরও কাছে।

উপোসে ক্লান্ত ইউসুফের হাই উঠছিল। দু চোখ জুড়ে আসছিল ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

তারপর একটু দূরে বড় চালতা গাছের ছায়ায় নিজেকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে দিলে ইউসুফ হালকা মতো ঘুমের ভেতর চলে যেতে পারে। সেই ঘুমে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আরও খানিকটা সর ফেলে দিয়ে যায়। উড়ে আসা আলগা আলগা বৃষ্টির গুঁড়ো ছুঁয়ে যেতে থাকে ইউসুফকে। অনেক, অনেক পানির স্বপ্ন দেখে ইউসুফ। কাচের বড় গ্লাস ভর্তি রঙিন বরফ পানি। আহা, কি ঠাণ্ডা। কি ঠাণ্ডা! জিভে দিলে গোটা জান জুড়িয়ে যায়। আর তখনই যেন বা জোবেদানের গলা শুনতে পায় ইউসুফ - অ সোনা, বাপ আমার, রোজার মধ্যে যেন রেডিয়ু শুনতে যেও না মোতালেবদের বাড়ি। মোল্লার ছাওয়াল রোজার মধ্যে রেডিয়ু শুনলি বদনাম হবে বাপ। অ সোনা, মনে রেকো দিকিনি।

জোবেদান তাকে রেডিও শুনতে বারণ করে। আধো-ঘুমের ভেতর বৃষ্টির ছোঁয়া গায়ে পেতে পেতে ইউসুফ মোতালেবদের সেই বিশাল রেডিওটাকে আকাশে ডানা মেলে ভেসে আসতে দেখে।

আকাশে ডানা ঝাপটানো রেডিও। তার থেকে ভেসে আসছে—আকাশবাণী কলকাতা—এখন খবর পড়ছি অসিতভূষণ দাস…… আকাশবাণী কলকাতা—এখন খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল · আকাশবাণী কলকাতা—এখন খবর পড়ছি বিজন বোস… আকাশবাণী কলকাতা—এখন খবর পড়ছি ইভা নাগ·· আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো· ·· তোমাদের ইন্দিরাদি বলছি—ছোট্ট সোনা বন্ধুরা ভাই, আদর আর ভালোবাসা নাও·· কি ভালো আছো তো সব ……

ইউসুফ শুনতে পাচ্ছিল। তার সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে 'হ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ'—এটাও শোনা যাচ্ছিল এই ফাঁকা মাঠের ভেতর থেকে।

শুক্কুরবার শুক্কুরবার রাত আটটায় নাটক। শিশুমহল, রবিবার সকালে। সব বন্ধ। এই একমাস রোজার জন্যে রেডিও শোনা যাবে না। মোতালেব সাড়ে নটা থেকে শুনবে না। তার বাবা না। দাদা-ইউসুফ, না। কেউ না।

মেঘমাখা আকাশের গায়ে ডানা ঝাপটানো রেডিওটি ধীরে উড়ে বেড়াচ্ছে। এ ও কি কোনো ফেরেশতা—ইউসুফ বুঝতে পারছিল না। তারপর একসঙ্গে হাম্বা রবে গোরুরা ডেকে উঠলে, গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা ছুঁয়ে গেলে ইউসুফের

চটকা ভেঙে যেতে চায়। নিজের গোর্ তাড়ানোর পাঁচন বাড়িটা কোথায়, খুঁজতে থাকে ইউসুফ। আর তা পেয়ে গেলে তার মাথায় ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এসে পড়ে। গোর্রা ছুটতে থাকে বাড়ির দিকে।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে।

ইউসুফ ছুট দেয় বাড়ির রাস্তায়।

আর এভাবেই আঠাশটি চাঁদ পার করে চাঁদ-রাত এসে যায়। কাল ঈদ। খুশি। উৎসব। নতুন জামা। মসজিদের সামনে ধুলোটে রাস্তাটি বৃষ্টি মেখে মেখে এখন খানিকটা কাদা কাদা। পা দিতে ঘেন্না লাগে। তবু উৎসাহী চ্যাংড়ারা বাঁশ কেটে দেবদারুর পাতা দিয়ে বড় করে গেট তৈরি করছিল। মাটি থেকে উঠে আসা মিনারের গায়ে মেঘলা ভাঙা আলো। বৃষ্টিধোয়া বাদাম গাছটির ডালে ডালে নতুন পাতা— এই বর্ষায় যেমন হয়ে থাকে। এইতো উনতিরিশ চাঁদের রোজা। আজকের রাতটি চাঁদ-রাত। কাল সকালে ঈদ-উল-ফেতর।

তেঁতুল বিচির লেই করেছে শোভান। মইন আলি সর্দার একটা ভারি লোহার কাঁচিতে রাংতা কেটে কেটে বাংলায় 'ঈদ মুবারক'— এই শব্দ কটি লিখে ফেলছিল। তার পাশে রাংতার চাঁদ-তারা, বাংলায় ৭৮৬। কাঁই বিচির আঠা দিয়ে এই সব অক্ষরগুলো বসানো হয়ে যাবে দেবদারু পাতার গেটের মাথায়।

শেষ রোজার দিনটা মন দিয়ে মানাচ্ছিল সবাই। চানের পর পাক-সাক— সাফ-সুতরো, পবিত্র হয়ে জোবেদান বিবি কাঠের রেহেলের ওপর কোরাণ রেখে পড়ে যাচ্ছিল। বাংলা কোরাণ। ঘরের কোণে একটি কাঠের তাকে আলাদা করে রাখা থাকে এই ধর্মগ্রন্থ।

জোবেদানের মাথায় ঘোমটা। সারা গায়ে খুব ভালো করে কাপড় জড়ানো।

কোরাণ পড়তে পড়তে—সুরা, আম পারায় যেতে যেতে জোবেদানের বারে বারে মনে হচ্ছিল —খোদার কুদরতে, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার অসীম কৃপায় এ বছর সুস্থ শরীরে রোজা রাখতে পেরেছি। শরীর-মন পবিত্র হয়েছে। সামনের বার আমি কি আবার পারব এই চাঁদ-রাত অব্দি এমন করে

রোজায় থাকতে! যদি আমার এ শরীরটা দুনিয়ায় না থাকে। যদি যাই কবরের অন্ধকারে! চোখ ফেটে, বুক মুচড়ে পানি আসছিল জোবেদানের। যদি না থাকি—এই বাড়ি, গোরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, গোয়াল, দলিজ—ধান-খড়ের হিসেব—জোবেদান বিবির বুক হু হু করে করে উঠছিল। বর্ষার জোলো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল কোরাণের পাতা। রোজা চলে যাওয়ার কষ্টে বুক ভাঙছিল জোবেদানের।

ঠিক তখনই ফেণিবিবি উঠোনের খোলা উনোনে সাজিমাটি মেশানো জলে কাপড় সেদ্ধ করছিল। উনতিরিশটা রোজা করা গেল না। মাঝে চার দিনের হায়েজ। স্যায়না মেয়েদের তো এই শারীরিক অসুবিধে থেকে মুক্তি নেই। যতদিন না বন্ধ হয়—অর্থাৎ নারীত্বের এই চিহ্নটুকু বয়সের ভারে, শরীরের ধর্মে জীবন থেকে সরে—ততদিন তো কোনো মুসলমান মেয়ের টানা উনতিরিশটা রোজা হয় না।

সাজিমাটি মেশানো জল ফুট কাটছিল উনোনের তাতে। দাওয়ায় স্থির থাকা দোলনায় ইদ্রিস কাঁদছিল। ওর এখন বুকের দুধের তেষ্টা—ফেণিবিবি বুঝতে পারছিল। আমি মুসলমানের মেয়ে, তবু টানা উনতিরিশটা রোজা হয় না—ফেণিবিবির চোখে জল আসছিল।

জোবেদান খুব ধীরে ওল্টাচ্ছিল কোরাণের পাতা। তার ঠিক পেছনে, দরজার বাইরে দাওয়ার ওপর এক্কাদোক্কা খেলছিল দুটো চড়াই। ইউসুফ পেছন থেকে কোরাণ পড়া দাদিকে দেখতে পাচ্ছিল। স্থির, যেন বা কোনো চেরাগ। ইউসুফের ভালো লাগছিল। দুচোখ থেকে আসা ধারায় জোবেদানের গাল ভিজে যাচ্ছিল।

আল্লাহতালার কি কৃপা, তুমি আমায় এই দুনিয়ায় রেখেছ—জোবেদান মনে মনে বিড় বিড় করছিল। রান্নাঘরে অনেক নারকেল কোরানো হয়েছে। তা থেকে বেটে দুধ তৈরি হবে। সেই দুধে চিনি মিশিয়ে ফোটান হবে সিমাই। আমার নতুন জামা হয়েছে। ইদ্রিসের জন্যে জামা। ইউনুসেরও—এসব মনে মনে ভেবে নিতে পারছিল ইউসুফ। আমি বুঝতে পারি না রোজার ঈদ চলে গেলে দাদি কেন কাঁদে! কেনই বা দাদা—গওহর আলি সর্দারের চোখে পানি! বয়স্করা রোজা ফুরিয়ে গেলে কেন চোখের জল ঝরায়—ইউসুফ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাতে চাঁদের দিকে তাকালে আশপাশের সব কিছুকেই অচেনা মনে হয় ইউসুফের। তার মনে হলো হিন্দুদের বড় পুজো চারদিনের। কত আলো। চারদিন চাররাত ধরে কত আনন্দ। আর মুসলমানের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এই একদিনই, চাঁদ-রাত! তারপর ঈদ। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আনন্দ শেষ। খুশি খতম। চাঁদ-রাত ফুরিয়ে যাবে, এমনটি মনে করতেই ইউসুফের চোখে পানি আর পানি।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেলে ইউসুফের মনে পড়ে আজ ঈদ। বাদাম-তলা মসজিদের সামনে কাদামাখা রাস্তায় বাঁশের গেট। তার ওপর দেবদারু পাতার বাহার। লাল-নীল কাগজের শেকল। রাংতায়—রুপোলি অক্ষরে লেখা—ঈদ মুবারক। ৭৮৬। পাশে চাঁদ-তারার ডিজাইন। সকালে রান্নাঘর থেকে গোস কষার গন্ধ পাচ্ছিল ইউসুফ। বাড়ির গোটা তিনকে মোরগ-মুরগি হালাল হয়েছে। খালপোশ করে, লোম বেছে সব ঠিকঠাক করে রাখছিল মা। মসজিদে ঈদের নামাজের পর সবাই গলা মেলায়। বুকে বুকে ঠেকায়।

সকলেরই পরনে নতুন পোশাক। মাথায় টুপি। মসজিদে শুধু ছেলেরা, নামাজের কাতারে। নামাজের পর বুকে বুক মিলিয়ে নেয়া। আমার মা দাদি, চাচি-মা, বড়বুবু, ছোটবুবু—সব বাড়ির মেয়েরা খালি ধোঁয়া ওড়ানো কাঠের আগুনে রান্নার খেজমতে দিন কাটাবে। তাদের কোনো আনন্দ নেই। খুশি নেই। নিয়েত নেই।

বাদামতলা মসজিদের সামনে ফকির-মিশকিনের ভিড়। কারোর লম্বা আলখাল্লা। গলায় নানা রঙ পাথরের মালা। হাতে জপের মালা—তসবি। কেউ বা আঁকাবাঁকা সাপ-চেহারার লাঠি হাতে। অন্য হাতে লোবানের ধোঁয়া উড়ে আসা পাত্র। লোহার লোবান-দানির ওপর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আবার এমনি ভিখিরিও। না খেতে পাওয়া গরিব মানুষ। আজ ফেতরা হবে। অবশ্য বড় ফেতরা বকরিদে—যাকে কিনা আমরা বলি, কোরবানির ঈদ।

মসজিদের সামনে ঘষা বরফ। একজন বেলুনঅলা। চাকা লাগানো গাড়িতে সিরাপের বোতল—লাল শাদা কমলা সবুজ। একটা ইট চেহারার

ঝকঝকে বরফ মোটা কাপড়ে জড়িয়ে গাড়িতে লাগানো লোহার ছুরিতে—অ্যালুমিনিয়াম পাতের ওপর বসান সেই লোহার ফাল দেখতে অনেকটা যেন র‍্যাঁদা ঘষতে ঘষতে ঝুরো ঝুরো বরফ জমিয়ে নিচ্ছিল ছোট খুরিতে। বরফ গুঁড়ো উঁচু চুড়ো হয়ে জমলে তার মাথায় লাল সিরাপ, শাদা আর কমলালেবু রঙের সিরাপও। সরু ছোট পাইপ সেই রঙ লাগা বরফের পেটে ঢুকিয়ে শু শু শব্দে টেনে নিচ্ছিল বাচ্চারা। বড়রাও কেউ কেউ।

রঙিন বেলুনঅলার কাঁধে ফেলা বাঁশের লম্বা লাঠিতে কাগজের মুখোশ; কাঠি দিয়ে নাচান তালপাতার সেপাই। রঙিন কাগজের ওপর কাঠি দিয়ে বেজে ওঠা কটকটি। বাচ্চাদের টিনের ঝুমঝুমি। লোলাকাঠি। পুরু পিসবোর্ডের ফ্রেমে লাল-নীল কাগজ বসান চশমা। হাতে নিয়ে দৌড়লে বাতাসের টানে ঘুরে ওঠা চরকি, সেখানেও লাল-নীল কাগজ, রাংতা আর কাঠির বাহার। ছুটলেই ঘুরবে, হাওয়ার ছোঁয়ায়।

ইউসুফ সবই মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। আমার কাছে পয়সা নি—নইলে সবই কেনাকাটা। আব্বা, চাচা, দাদা কয়েকটা খুচরো এনে ফেতরা দিচ্ছিল ফকির-মিশকিনদের বাটিতে। হাতে। তারা দোয়া করছিল। ঈদের নামাজের পর বাদামতলায় খানিকক্ষণ ভিড় থাকে। তারপর সবাই যে যার নিজের বাড়িতে। মাংস, সিমাই, লচ্ছা, পরোটা, কাবাব—এসব দিয়ে মেহমানের খাতিরদারি করার জন্যে।

ফেণিবিবি মুসুর ডাল বাটছিল। কাল রাতে ভেজানো আছে। হামানদিস্তায় গোস থেঁতো করে আদা লংকা পেঁয়াজ রসুন বাটার সঙ্গে সামান্য কষে নিয়ে মুসুর ডাল বাটা আলাদা করে কষে তারপর একসঙ্গে মিশিয়ে ছাঁকা সর্ষের তেলে ভাজা টিকিয়া। পরোটা দিয়ে খেতে দারুণ। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডের মুখ থেকে সিমাই এসেছে।

বহুদিন পর খোলা হয়েছে কাঠের সিন্দুকের ডালা। গহর আলি সর্দার তার টুপির বাক্স থেকে টুপি বের করে পরেছে। আমার আব্বার মাথায় যে জরির টুপি তাও ঐ বাক্সতে ছিল। সবই দেখতে পাচ্ছিল ইউসুফ।

বৃষ্টির দিনে বেরতে ইচ্ছে করে না। তবু আজ সকাল থেকেই পানি নেই। নতুন জুতো হাতে কেউ কেউ পায়ের ফোসকা সামলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বাদামতলা মসজিদের দিকে যাচ্ছিল।

মোত্তালেব সিল্কের পাঞ্জাবি-পায়জামা পরেছে। মাথায় কালো রঙের টুপি। পাজামা-পাঞ্জাবি ঘি রঙের। ইউনুস আলি সর্দারকে বড় সুন্দর লাগছে। নিজের দাদাকেই ঠিক মতো চিনতে পারছিল না ইউসুফ। বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আবারও বাদামতলায় মসজিদের সামনে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে ইউসুফ শুনতে পেল মায়ের গলা—বাশার মা-কে খাবার দিয়ে আসতে হবে।

ইউসুফ জানে সে ছাড়া এই কাজটি করার কেউ নেই। তাই চুপ করে যেতে হয়। তারপর এক সময় সকাল গড়িয়ে দুপুর এলে, বহুদিন পর দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বাশার মায়ের পরোটা পায়েস মাংস টিকিয়া—সব বড় খানচায় সাজিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে নিয়ে যায় ইউসুফ। তার পরনে নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। কাঠের ভারি সিন্দুকের ডালা খুলে কড়ির প্লেট, জার্মান সিলভারের প্লেট, জার্মান সিলভারের কাঁটা-চামচ বেরিয়েছে। সে সবে আজ মেহমানরা খানা খাবে।

এ রাস্তায় কাদা আছে।

কাদা মাড়িয়ে, গাছের ছায়া, কচু ঝোপ পেরিয়ে ইউসুফ সেই হেলে পড়া ঘরের সামনে বাশার মা, বাশার মা বলে ডাক দেয়।

তারপর খানিকক্ষণ সময় কেটে গেলে, কে বাপ—গহরের নাতি, বেঁচে থাক—আমার মাতার চুলির সমান হায়াৎ হোক। আহা বাপ, কি সোন্দর লাগচে, আসমানের ফেরেস্তা—বাশার মা এরকম কত কি বলতে থাকে।

ঘরের দরজার সামনে সেই বুড়ি এসে দাঁড়ালে তার মাথায় তেমনই পাকা চুলের বোঝা দেখতে পায় ইউসুফ।

দাদি পেটিয়েচে—তোমার খাবার—এটুকু ইউসুফ নিজের মতো করে জানিয়ে দেয়। খাবার রেখে বাসন খালি করে দিতে বলে ইউসুফ। বাশার মা খানচাসুদ্ধু ধরে ভেতরে নিয়ে যায়।

খালি খানচা আর ঢাকা দেয়া ন্যাকড়া হাতে ফিরে আসতে আসতে আবারও বাশার মায়ের গলা শুনতে পায় ইউসুফ—আমার চুলির সমান হায়াৎ··· ।

বাড়ি ফিরে আবারও মসজিদের সামনে। সেখানে তখনও বাঁশ-দেবদারুর গেট। ঈদ-মুবারক। চাঁদ তারা। কাল চাঁদ-রাত ছিল। আজ ঈদ—শেষ। আনন্দ, খাওয়া দাওয়া—সব এক দিনে। ইউসুফের মন খারাপ। সন্ধের মুখে বাড়িতে মেহমানরা আসছিল। তাদের জন্যে পরোটা, মাংস,

সিমাই, টিকিয়া। গওহর আলি সর্দারের গোলাবপাশ থেকে গোলাপ জল ছেটান হচ্ছিল মেহমানদের গায়ে। বাতাসে সুগন্ধ।

ঈদ-মুবারক। হামদুলিল্লা—এমন নানা উচ্চারণ ভাসছিল বাড়ির বাতাসে। দাদি, মা, চাচিমা, বড়বুবু, ছোটবুবু এরা সবাই রান্না করতে করতে, খানা দিতে দিতে, বাসন মাজতে মাজতে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে ঈদের রাত গভীর করে দিতে পারছিল। রাত খানিকটা বেড়ে গেলে মেহমানের ভিড় কমে যায়। বাড়ির পুরুষমানুষরা সবাই কখন খেয়ে নিয়েছে। রান্নাঘরে, কেরোসিনের ধোঁয়া ওড়ানো কুপির পাশে জোবেদানবিবি তার ছেলের বউ, নাতনিদের নিয়ে খেতে বসেছিল। আকাশে ঈদের ফালি চাঁদ। এই চাঁদের হিসেবেই—চাঁদ দেখা গেছে, সেই অনুযায়ী আজকের এই উৎসব—তবু চাঁদ কেমন যেন তার মেঘলাগা আলোয় ঘোলাটে ছিল।

দূরে দূরে সবুজ পাতা, গাছ-গাছালির ওপর তার হলদেটে আলো। ইউসুফ কখন যেন ঘুমিয়ে গেছে। দড়িবোনা দোলায় ইদ্রিসও। খুব ধীরে জোলো বাতাস বইছিল। তার টানে সার গাদার গা ওলটানো গন্ধ এসে ঢুকছিল নাকে। এমনটি তো অভ্যাসই হয়ে গেছে।

নিজেদের বাড়ির সামনে মাটির দলিজ জ্যোৎস্নায় অন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ায় জোবেদানের শীত করছিল। গায়ে কাপড়টি ভালো মতো জড়িয়ে দুপুরের ভিজে ভাত, ছোলার ডাল, খানিকটা কচুর তরকারি, ওবেলার ঠান্ডা পরোটা কয়েকটা, ভাঙা টিকিয়া দু চারটে, গোস-এর ঝোল-আলু—সব মিলিয়ে রাতের খাওয়া। ঈদের রাতের খানা। বাটির কোণে একটু রান্না করা সিমাইও ছিল। এইসব মেয়েদের জিগ্যেস করার কেউ নেই। নতুন করে রাঁধার প্রশ্নই ওঠে না। তবু জোবেদানের হাত ভাতের গরাস মাখছিল। ফেণিবিবি, মরিয়ম বাইরে।

ঝিপ ঝিপ ঝিপ ঝিপ করে পানি পড়ছে। কখন যেন মসজিদে শেষ হয়ে গেছে এশার আজান। দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছিল। উঠোনে নজর করলে আকাশ থেকে নেমে আসা বৃষ্টিধোয়া চাঁদ-মুখ নজরে পড়বে। হালকা হালকা বৃষ্টির সঙ্গে জ্যোৎস্নাও হেসেছিল। ছোলার ডালের সঙ্গে ভাতের বড় বড় গরাস মেখে গালে তুলে দিতে দিতে জোবেদানের মনে পড়ছিল শ্রাবণে ঘুটিয়ারি শরিফের মেলা। সারা রাত উৎসব। উরশ-এ গোলাপ-পানি, ধূপবাতি, বাতাসার ছড়াছড়ি। পীরবাবার কাছে মোরগ, খাসি সব

দিয়েই মানত করা যায়। মাজারের পাশেই মক্কা-পুকুর। পানিতে ফুল ভাসিয়ে দিলে তা ফিরে এলেই মনে যা চাওয়া, তাই হবে। এবার যাব পীরবাবার উরশ-এ—জোবেদান মনে মনে ভাবছিল। বাইরে বৃষ্টি জ্যোৎস্না ধুইয়ে দিচ্ছিল। সত্যেরই শ্রাবণ পীরবাবার উরশ—সেখানে হাজত দেব। নয়ত কোনো এক বেস্পতিবার—যেদিন বাবার মাজারে ভিড় হয়—জোবেদান মনে মনে বলছিল।

নয়

রেডিয়ু, রেডিয়ু, আমাদের বাড়ি রেডিয়ু এনেচে আব্বা। মোতালেব খুব সকালে চ্যাঁচামেচি করে বেশ কয়েক মাস আগে গোটা পাড়া মাথায় করছিল।

ঘুম ভেঙে মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টি দেখলে মন খারাপ হয়ে যায় ইউসুফের। তব, মোতালেবের ডাকে রেডিয়ু দেখতে তাদের বাড়ি আসতে গিয়ে দু চারটে মোরগা-মুরগি, ছাগল, সেই প্রাচীন দলিজ-ঘর—সব পেরিয়ে ছুটে আসতে হয়েছে ইউসুফকে। মোতালেবদের গোয়াল ঘর থেকে কাঁচা গোবর, চোনার গন্ধ উড়ে আসে। এ নারকেল গাছ এরিয়াল টাঙানো হয়েছে। তিন আঙুল চওড়া, জাল চেহারার এরিয়াল। পালিশ করা কাঠের বডির ভেতর আলো জ্বলে। গান হয়। কথা ভাসে। তাব জন্যে আলাদা ব্যাটারির বাক্সে তার লাগিয়ে চালু করে দিতেই রেডিও কথা বলে।

উঠোনের মাঝখানে মোতালেব। তার বাবা আয়নাল আলি মন্ডল। আকাশ মেঘলা। তাই রেডিওর মাথায় ছাতা। একটু দূরে ব্যাটারির বাক্স। রেডিও কথা বলছিল। এর মধ্যে কি মানুষ আছে! যাদের চেহারা পুতুলের থেকেও ছোট! ইউসুফ ভাবতে চাইছিল। পাড়ার বহু মানুষ ভিড় করে এসেছে মজা দেখতে। রেডিও কথা বলছে। কেউ কেউ ঘুরেফিরে দেখছে এর মধ্যে কী ভাবে ঢুকল মানুষ! ভিড়ের মধ্যে পৌষিও দাঁড়িয়ে। রবে মুচির মেয়ে পৌষি চোখ বড় বড় করে মজাটা দেখতে চাইছিল।

আকাশবাণী। এখন খবর পড়ছি অসিতভূষণ দাস। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো—

ভয় পেয়ে দু চার পা পিছিয়ে যাচ্ছিল ভিড়।

অ্যাই চুপ মার্। চুপ মার সব—নার্ভাস আয়নাল আলিমণ্ডল নিজের হাতে বাঁধা অ্যাংলো সুইস ক্যাভালারির সময় মিলিয়ে নিচ্ছিল।

এখন সকাল সাড়ে সাতটা—কলকাতা ক-তে দিল্লির বাংলা খবর শোনা যাচ্ছে। লোকজন রেডিও ঘিরে দাঁড়িয়েই ছিল।

ইউসুফ বুঝতেই পারছিল না রেডিয়ুর ভেতর মানুষ না থাকলে কেমন করে কথা শোনা যায়! একি তবে কোনো গায়েবী আওয়াজ! যার কথা শোনা যায় পুথি-কেতাবে? আসমান থেকে নেমে আসা জিব্রাইল বা অন্য কোনো ফেরেশতার কণ্ঠস্বর!

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ লোকসভায় বিরোধীদের প্রশ্নের এক উত্তরে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের .. রেডিও নিজের মতো করে খবর প্রচার করছিল। মেঘলা চারপাশের ভেতর সেই প্রচার ঘিরে মোতালেবদের উঠোনে বেশ কিছু লোকজন।

এক নারকেল গাছ থেকে অন্য নারকেল গাছে টাঙানো এরিয়ালে দুটো চড়াই বার বার এসে বসছিল।

রেডিও বলে উঠল —এখানকার মতো খবর এখানেই শেষ হলো—

সুইচ নিভিয়ে, তার খুলে দিয়ে আয়নাল আলি মণ্ডল ভিড় পাতলা করে দিতে চাইছিল। মেঘ সরে গিয়ে হঠাৎ রোদে হেসে উঠল আকাশ। দলিজের ছাদে এক ঝাঁক বন-চড়াই এত জন মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা ছোট উড়ান দিয়ে পাশের কাঁঠাল গাছের সবুজে মিশে গেল।

কাঠের দুটো আলাদা আলাদা পিঁড়ির ওপর থেকে ব্যাটারি-বাক্স আর রেডিও সেট তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গুছিয়ে রাখতে চাইছিল আয়নাল আলি-মণ্ডল।

মোতালেব তার আব্বার পেছনে পেছনে রেডিও সেটের সামনে। চোঙার সামনে বসা কুকুরের ছোট্ট মনোগ্রাম আর তার সঙ্গে লেখা এইচ. এম. ভি— এই তিনটি অক্ষর আয়নাল আলি মণ্ডলের হাতের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল।

আর তখনই বাঘরোলে কার্তিক চৌকিদারের কচি ছেলেরে বাঁশ বাগানে নে গেল—বলতে বলতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ গলার স্বর এদিকে ছুটে আসে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দম নেয়া এই চার-পাঁচ জন বালককে বয়স্করা থামায় ও বাঘরোল কীভাবে কার্তিক চৌকিদারের ছেলেকে বাঁশবাগানে টেনে নিয়ে যায়, তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে থাকে। এখনই থানায় খবর দেয়া দরকার—কেউ কেউ এমন পরামর্শ দিতে পারে।

পুলিশ কী করবে!

ক্যান বন্দুক দে গুলি করি। চ, লাটি নে যাই—দেখি শালার বাঘরোল কোতায়—বলতে বলতে বেশ কয়েকটি লাঠি, ধান-কাটা কাস্তে, হেঁসো, বল্লম জড় হয়। শোভান, মইন, মিজান আলি সর্দার, আয়নাল আলি মণ্ডল—সবাই তখন শিকারী হয়ে ওঠার নেশায়।

বছরে একবার, এই শীতের সময়ে সাঁওতাল, নাকি অন্য কোনো ঐ চেহারার মানুষ—দল বেঁধে তীর-ধনুক, ডাণ্ডা, টাঙি নে আসে। হই-রই, হই-রই করে জঙ্গল ঘেরে। ক্যানেস্তারা বাজায়। শেয়াল মারে। সড়েল, বাঘরোল মারে। লাফা—যা সামনে পায়। ওদের হাতে দারুণ টিপ। ভয় নেই। আয়নাল, ইউনুস, শোভান, মইন, মিজান আলি সর্দার—সবাই যেন বাঘরোলের খোঁজে সেই আদিবাসী শিকারীদের মতোই হয়ে উঠতে চায়।

আকাশ মেঘভারে তেমনই মলিন। চারপাশে বর্ষা দিনের ম্লান আলো। আকাশ চুঁইয়ে যখন তখন এক-দু ফোঁটা পানি পড়ে। রাস্তায় জমা কাদা। ঘাসের মাথায়। গাছের ডগায় জোঁক।

বড়দের এই যুদ্ধযাত্রা দেখতে দেখতে ইউসুফের মনে হচ্ছিল আজ সকালেই মাঠ থেকে পায়খানা করে ফেরার সময় তার পায়ে, পাছায় জোঁক লেগেছিল। রক্ত টুপটুপে না হলে ছাড়ে না কিছুতেই। নুন দিলেই শেষ। শরীর থেকে সব রক্ত বেরিয়ে গিয়ে খতম। এই বর্ষায় বনে-বাদাড়ে থুক থুক করে জোঁক। গোরুর গায়ে লাগে। ছাগলের। মানুষকে ধরে। রক্ত হলেই হলো।

কার্তিক চৌকিদারের বাড়ি রেনিয়ার বাদার দিকে। সেখানে এখন এক হাঁটু কাদা প্রায়। চালতা গাছ, গাব গাছ, করমচা, নারকেল গাছের সারি, আনসার আলির পুকুর, পুকুরের জলে বাঁধা আড়া, মাছ ধরার ফুট, পাশে উঁচু আড়া—কব্বরডাঙা—সব পেরিয়ে যেতে হবে।

কার্তিকদা আমাদের নিজেদের লোক—তাকে দেখতে হবে—বলতে বলতে বাদামতলার এই দলটি কাদা ভেঙে জঙ্গল মাড়িয়ে বেনিয়ার বাদার দিকে চলে গেল। পাট চাষ হয়েছে মাঠ জুড়ে। তার সবুজটুকু চোখে লাগে। মাঠের

জমা জলের পাশে বক, মাছরাঙা। একদল সশস্ত্র মানুষ বাঘরোল খুঁজতে মাঠ ভাঙছিল।

তারপর প্রায় চল্লিশ মিনিট জল কাদা জঙ্গল পেরিয়ে তারা যখন কার্তিক চৌকিদারের বাড়ির সামনে পেঁছয়, ততক্ষণে বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে চাপা কান্না শুরু হয়ে গেছে। বাজপড়া গাছ হয়ে মাটির উঁচু দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ঠেস দিয়ে বসেছিল কার্তিক। তার চোখ লাল। ধুতি হাঁটুর কাছে তোলা। এক মাথা চুল উস্কোখুস্কো।

বাগান থেকে জোঁক ধরেছিল ইউনুসের পায়ে। পায়ে ঝাড়া দিয়ে দিয়ে জোঁকটাকে বার বার ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছিল ইউনুস। পারছিল না। তারপর হাত দিয়ে জোঁকটিকে টেনে মাটিতে পেড়ে ফেলে অন্য পায়ের বুড়ো আঙুলে পিষে—মাটিতে খানিকটা রক্তের দাগ ফুটে উঠেছিল।

কার্তিকদা— কাঁপা গলায় বলল শোভান। আর এটুকু বলার অপেক্ষা-তেই বুঝি ছিল কার্তিক চৌকিদার—ছুটে দাওয়া থেকে নেমে এসে, পেছল উঠোনে একবার প্রায় আছাড় খেতে খেতে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে—ভাইরে, সব গেল—আমার খোকাটারে—মণিটারে—

আর এরপর তারা সবাই মিলে লাঠি বল্লম হেঁসো কাস্তে নিয়ে কাদা, জঙ্গল, ঘাস পেরিয়ে সেই বাঁশবাগানটিতে পেঁছয়। বর্ষার আলো-আঁধারিতে সেই বাঁশবাগান যেন বা কোনো প্রেতপুরী। বাঁশ কাটার পর খানিকটা খানিকটা যে গুঁড়ির আভাস তার গায়ে আটকে থাকা শিশুর কাঁথায় বৃষ্টি ফোঁটার দাগ। অপটুহাতের রঙিন পাড়ের সুতো দিয়ে সেলাইয়ের ফোঁড়। কাঁথাটি আটকে আছে।

শোভান আলি সর্দার হাতের লাঠি দিয়ে কাঁথাটি টেনে আনে।

আহা! তার গায়ের নকশায় শৃঙ্খলতা। হেমু, বান, বকেয়ার এলোমেলো চিহ্ন। লাঠির টানে কাঁথা কাছে আসে। তার গায়ে তখনও নিজের সন্তানের শরীরে মাখানো সর্ষের তেলের গন্ধ।

কাঁথাটি হাতে নিয়ে কার্তিক ফুঁপিয়ে ওঠে। এক পশলা হালকা বৃষ্টি বাঁশ ঝাড়টিকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

একটি কাঁথার ওপর মাস তিনেকের শিশু। আর একটি কাঁথা মোড়া হয়ে দালানে। তখন সবে বিকেল মুছে গিয়ে সন্ধে নামছে। ঘরে হারিকেন আনতে গেছে মা। হারিকেন এনে আলো জেলে আলো আর ছেলে নিয়ে

একসঙ্গে ঘরে যাবে। সন্ধে-প্রদীপ দেবে। আর আবারও দাওয়ায় ফিরে এসে সে ছেলেকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেখে সেদিকে পিঠ রেখে হারিকেনের কাচ সাফ করে আলো জ্বালানোর জন্যে যেটুকু সময়, তা খরচ করতেই আবারও এদিকে ফিরে আর সন্তানকে দেখতে পায় না। আর দেখতে না পেয়ে কান্নায়, চিৎকারে ভেঙে পড়ে সে তো দূরে যে দু-একটি কাঁচা বাড়ি আছে, তার মানুষদের জাগিয়ে দিতে পারে।

বাচ্চা দানোয় না কিসে নিয়েছে, তা নিয়ে খানিক সংশয় তারপর শেয়ালে বা বাঘরোলে হতে পারে, হয়ত আধবাঘা—এমন মন্তব্য থেকে অনেকেই হারিকেন, লাঠি হাতে এগিয়ে দেখতে বলে। তারপর সেই বাঁশবাগান, অন্ধকার, হারিকেনের আলো, হেই-হো, হেই-হো চিৎকার, লাঠি দিয়ে ধপাধপ ঝোপ পেটান—সঙ্গে সতর্কবাণী—'দেখিস সাপ আছে কিনা'-বলতে বলতে আঁধার বাড়ে। তারপর কার্তিক কলকাতা থেকে কি একটা কাজ সেরে ফিরে খানিকটা বিহ্বল হয়ে, খানিকটা কান্নায় নিজেকে সামলে বাঁশবাগান, তার চারপাশের আলো-অন্ধকার, দানো ও পিশাচ-ভূত, গন্নাকাটার ভয় মাখানো জায়গাগুলি দেখে বাড়ি ফিরে। সে রাতে তারা স্বামী-স্ত্রী মুখে খাবার তুলতে পারেনি। ঘুম নামেনি চোখে।

তারপর আজ সকালে খবরটি একান-ওকান হতে হতে শেষ অব্দি নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে এই অভিযান। পাশেব সেই রঙিন সুতোয় ফোঁড় তোলা কাঁথা দেখে, তা হাতে ছুঁয়ে কার্তিকের বৌ কেঁদেই যায়। তার স্বপ্নে শিশুর দেয়ালা। তবু কাঁথাটা হাতে ধরাই থাকে। তার সঙ্গে কান্না। কান্না…

আয়নাল আলি মণ্ডল আজ সকালে আবারও ব্যাটারিতে চলা বড় রেডিওতে সকাল সাড়ে সাতটার দিল্লির খবর শোনার চেষ্টা করছিল। আকাশবাণী, এখন খবর পড়ছি ইভা নাগ…। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো…। গমগমে গলা ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে।

আয়নাল সেন্টারের কাঁটাটি ঠিক করে ধরার চেষ্টা করছিল। কুঁ কুঁ কুঁ শব্দে কি একটা ওয়ারলেস সাউন্ড ধরা পড়ছিল, রেডিওর শব্দ তরঙ্গে। আজ শুক্রবার—রাত আটটায় নাটক আছে—কলকাতা ক-এ।

আয়নাল মনে মনে বলছিল। ইসলামে রেডিও শোনা, তারপর আবার

রেডিও-নাটক—সবই না-জায়েজ। তবু আয়নাল জানে তার ঘরে নাটক শোনার জন্যে আশপাশের বাড়ির বৌ মেয়েদের ভিড় হবে। ঘর প্রায় ভরে যাবে। খবর শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগায় হঠাৎ কাঁটা ঘুরিয়ে আয়নাল রেডিও পাকিস্তান ঢাকায় চলে যেতে পারে। খুবই স্পষ্ট, গমগমে স্বরে ঢাকা রেডিওর ঘোষক জানালেন—'এখন গ্রামোফোন রেকর্ডে আব্বাসউদ্দিনের গান....'

সেই 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দে রে'-র আব্বাসউদ্দিন—তাঁর রেকর্ডবন্দি গলা শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যাচ্ছিল আয়নাল। ঢাকা থেকে এখন মাঝে মাঝে নুরজাহানের গানও দেয়। আয়নাল বুঝি বা নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছিল। নুরজাহানের গলার সেই মাদকতা, সুর—এ সবই তো ইসলামে না-জায়েজ—তবু রেডিয়ুর নানান প্রোগ্রামে ডুবে যেতে যেতে আমি যেন বা নিজেকে নতুন নতুন করে খুঁজে পাই। ঢাকা রেডিওর টাইম আমাদের থেকে আধ ঘণ্টা এগিয়ে—মনে মনে বলে নিতে পারছিল আয়নাল। তারপর খান তিনেক রেকর্ড বাজানোর পর এক সময় আব্বাসউদ্দিনের গান থেমে গেল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের আমলে দেশে কী কী উন্নতি হয়েছে, তা ভ্যাড় ভ্যাড় ভ্যাড় ভ্যাড় করে বলতে শুরু করলে খানিকটা শোনার পর বিরক্ত আয়নাল আলি রেডিওর নব ঘুরিয়ে কলকাতা ক নিয়ে আসে। তার এই সেটটি অলওয়েভ। বি বি সি, মস্কো, ভয়েস অফ আমেরিকা, পিকিং, করাচি, লাহোর, সব স্টেশনই ধরা যায়। সন্ধের পর কোনো কোনো দিন ঝেঁপে বৃষ্টি এলে আয়নাল এই ভাবে রেডিও নিয়ে চালাচালি করতে থাকে। এক সেন্টার থেকে অন্য সেন্টারে কাঁটা ছুঁয়ে যায়। কত রকমের ভাষা। কত খবর। গানের নানা সুর। আয়নাল বিস্মিত হতে থাকে।

অনেক রাতে জোবেদান তার নাতি নাতনিকে বিছানায় শুইয়ে গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে নিজে জেগে। বাইরে অন্ধকার পৃথিবী। সেখানে একটি দুটি জোনাকির ফুল। ইউসুফ গভীর ঘুমে। জুবেদানও। সামনে রাস্তায় ওঠার আগে মাটির দলিজ-ঘর তেমনই ভূত হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি আজ রেডিয়ুর নাটক শুনতে গেছিলাম মোতালেবদের বাড়ি। জোবেদান নিজের মনেই বলছিল।

মাগী-মদ্দা—সব মিলি একসঙ্গে। খালি কতা কতা আর কতা। সব

কথা বুঝতেও পারে না জোবেদান। তবু কোথায় কোথায় যেন ভালোবাসা, দুঃখ, সুখ—সব একসঙ্গে তার মাথার ভেতর খোদাই হয়ে যেতে থাকে। চোখে পানি আসে। যেমনটি পুঁথি-পাঠ শুনলে—সুরে সুরে কথায় আমি যেন অন্য কোনো দুনিয়ায় চলে যেতে পারি। সেখান থেকে কব্বর দেখা যায় খালি। রোজ কেয়ামতের দিন। হায় আল্লা! কি হবে! নাটক শুনলে ঠিক তেমন নয়, তবু কেমন যেন এক কষ্টে, কখনও কখনও জোবেদানের চোখে পানি এসে পড়ে। যেমন আজকে। জোবেদান কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে নিচ্ছিল।

বাইরে সেই ঘোর অাঁধারে শোনা যাচ্ছিল কার্তিক চৌকিদারের গলা—এই হো—এই হো-হো— ওর খোকাটারে বাঘরোলে নে গেল—কেউ কিচু করতি পারল না। ঘরে জোয়ান বৌ—জোবেদান বুঝি বা নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছিল এই সব। তারপর বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে কার্তিক চৌকিদারের পাহারাদারি হাঁক শুনতে শুনতে জোবেদান বুঝি বা ঘুমে চলে যেতে চায়। হাই তুলতে তুলতে তার মনে হয় এই যে রোজার ঈদ গেল, এর পঁয়ষট্টি চাঁদ পরেই বকরিদ। কোরবানির গোরু কেনা আছে। তার জন্যে মোটা টাকা লাগবে। সেই টাকা যোগাড় করতে হবে। নিজের স্বামী গওহর আলি এখনও এসব ব্যাপারে ছেলেমানুষ। সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে—এসব যেন নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছিল জোবেদান। বড় বড় হাই তুলছিল। দূর থেকে কার্তিক চৌকিদারের এই হো হো—এই হো—শুনতে শুনতে তার দু চোখের পাতা নিজের নিয়মেই জুড়ে যাচ্ছিল।

দশ

আর এভাবেই কোরবানির ঈদ—ঈদ্ উজ্জোহা এসে যায়। দু দিন আগে থেকে গোরু কেনা আছে বাড়িতে। কোরবানি হবে। জোবেদান শুনেছে পার্কসার্কাস, খিদিরপুর, রাজাবাজারে নাকি উট কোরবানি হয়। উট নাকি নিজে নিজেই হাঁটু গেড়ে বসে কোরবানির ছুরিতে নিজের গলাটি বাড়িয়ে দেয়।

আল্লার কি কুদরত। জোবেদান মনে মনে ভাবে। বারুইপুরের গো-হাট থেকে গোরু কিনে হাঁটিয়ে এনেছে মইন আর ইউনুস। চাচা ভাইপো

ঙ্জনে গেছিল। খিদিরপুর, রাজাবাজার, বারুইপুর—সবখানেই এই ঈদের আগে খাসি, গোরুর মার্কেট। মালের চেয়ে দালাল বেশি। বাঁশের বাটের বড় ছাতা বগলে এমন করে পান জর্দায় কালো দাঁত জুবড়ে হাসবে—মইন সুন্দর দেখায়, সেই গোরুর দালালটিকে, যার লুঙ্গি কিনা হেঁটোর কাছে তোলা।

বলতে বলতে মইন দেখতে পায় বারুইপুরের সেই বিশাল গো-হাটা। আমরা সেখানে গেলে এক বাতান দালাল আমাদের ঘেরে। সকলেরই প্রায় হেঁটোর ওপর লুঙ্গি। বগলে বাঁশের বাটের ছাতা। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। নয়ত জীর্ণ, রঙ ওঠা শার্ট, কাঁধে গামছা। খালি পা।

গোরুর হাটে একগাদা গোরুর ভেতর থিকথিকে দালাল। সবাই বলে দাম কম, ভালো মাল দেখাব। খুঁতো জানোয়ার হলে চলবে না। দেখতে একটু ভালো হওয়া চাই। নিয়ম হলো নিজের হাতে পালন করা—সারা বছর ধরে খাইয়ে দাইয়ে বড় করা পশুটিকে এই ঈদে হালাল করা—যেমনটি হজরত ইব্রাহিম করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের প্রিয় পুত্রকে আল্লাহতালার কাছে ...আর আল্লার রহেমে করুণায় ছেলের বদলে দুম্বা কোরবানি হলো।

আমাদের ইসলামে নিয়ম কোরবানির মাংস তিন ভাগ হবে। সমান তিন ভাগ। এক ভাগ যে কোরবানি করল তার। এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন। একভাগ পাড়া-প্রতিবেশী, ফকির-মিশকিন। আমার হাতের তৈরি দুটো খাসি আছে। তাও কোরবানি হবে ঈদের দিন, তাতে বড় জোর আঠার-কুড়ি কেজি মাংস—সে তিন ভাগ করলে পাড়া-প্রতিবেশী, ফকির মিশকিনই বা কী পাবে! আর আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে নিজেরাই বা কী খাব। তাই গো-হাটায় যাওয়া।

মইন বলছিল, এই গোরুর দাম পাঁচশো টাকা। ছোট দিশি গোরু। কপালে চাঁদের টিপ—শাদা রঙের। গায়ের রঙ কালো, দেখনাইয়ে বেশ বাহার। তা মাংস হবে একশো পনের থেকে কুড়ি কিলো। বাড়িতে সেরপাল্লা—বাটখারা সবই আছে। হালালের পর খাল ছাড়িয়ে নিয়ে মাংস বাঁট করলে ফ্যাপসা, রাং, বট, কলিজা, দিল—সব আলাদা আলাদা স্বাদ। খাল ব্যাচা টাকায় ফেতরা হবে—ফকির-মিশকিন পাবে। মইন দেখাচ্ছিল কেমন করে গোরুর দালাল তার ছাতায় লাগান পেরেকের খোঁচায় বসে যাওয়া গোরুকেও তুলে দিতে পারে। একবার খোঁচা-খাওয়া গো-হাটার গোরু

ছাতা দেখলেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় খোঁচার ভয়ে। তখন আর তাকে অসুস্থ মনে হয় না। সেই গোরু বিক্রি হয়ে যায়।

গুনে গুনে পাঁচটা একশো টাকার কলাগাছ মার্কা বড় নোট গুনে দিচ্ছিল মইন আলি সর্দার। পাশে দাঁড়ান ভাইপো ইউনুস। ইউনুসের মনে পড়ছিল এই তো কদিন আগে আমি ইউসুফ মোতালেব কুন্ডুবাবুদের গদীতে একশো টাকার নোট দেখতে গেছিলাম। গদীতে সেদিন হপ্তা দেওয়ার দিন। মোতালেব বলেছিল, একশো টাকার বড় নোট দেখা যাবে কুন্ডুবাবুদের গদীতে। আমরা তিনজন—আমি, মোতালেব, ইউসুফ—দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি কলাগাছমার্কা বড় নোট। দু চোখে বিস্ময় ভাঙছিল। তারপর একটু সাহস করে কাছে যেতে আরও স্পষ্ট নোটের চেহারা।

কোরবানির গোরু কিনে তারা ফিরে আসছিল।

তেমন বড় নয়, তবে মাংস আছে। ছোট শিঙ। গাভীন হয়নি একবারও।

ছাই ছাই রঙের চামড়ায় দুটো মাছি উড়ে উড়ে বসছিল। গা কাঁপাচ্ছিল চারপায়ে হাঁটতে হাঁটতে। ইউনুসের হাতে গোরুর দড়ি। ন্যাজের কাছে ইউসুফ। হাতে পাঁচনবাড়ি।

মাঝে মাঝে গোরু থেমে গেলে তার পিঠে, পাছায় দু-এক ঘা দিতেই হয়। সে কাজের দায়িত্ব ইউসুফের ওপর। তারা তিনজন গোরু নিয়ে হাঁটছিল।

রাস্তা কম নয়।

যেতে যেতে গোরুটি দু-একবার পেছনে তাকাচ্ছিল। তারপর আবার সামনে হাঁটা। সামনে হাঁটা।

গোরু হাঁটিয়ে নিয়ে হাট থেকে আমরা ফিরে আসছিলাম। একটা লোককে টাকা দিয়ে দিলে, সেও এই কাজটা করে ফেলতে পারত, চাচা রাজি হলো না। মোতালেবদের বাড়িতেও নতুন গোরু এসেছে। তার হামলানো শোনা যাচ্ছিল এবাড়ি থেকে। ইউনুস শুনতে পাচ্ছিল।

ঈদের সকালে মসজিদে নামাজ হয়ে যাওয়ার পর কোরবানি শুরু হয়ে যায়।

কয়েকদিন গোরু ছিল এবাড়িতে। তাকে মাঠে নিয়ে ঘাস খাওয়ানো। ডাবায় খোল-ভূষি, ভাতের ফেন। ঈদের সকালে তাকে শিঙে দড়ি বেঁধে,

মাটিতে ফেলা হবে। তারপর কোরবানির ছুরিতে—আড়াই পোঁচ। সের-পাল্লা, বাটখারা নিয়ে মাংস সমান তিন ভাগে ভাগ করা—ওজন করে পাঠানো নিয়ম—এক ভাগ আত্মীয়ের বাড়ি। এক ভাগ নিজেদের। এক ভাগ ফকির-মিশকিন।

খাল ছাড়ান মাংস বটি করলে সারা গায়ে, জামায়, লুঙ্গিতে চর্বির গন্ধ জড়িয়ে যায়।

মা, দাদি ছোট হাত-কুড়োলে মাংস কুটছিল, কাঠের ওপর রেখে। থপ থপ, খচ খচ শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ইউসুফ। তারপর পাল্লা-বাটখারায় ওজন করে ভাগ করে ফেলছিল মা, দাদি।

বারুইপুর, বিবিরহাট, মগরাহাট, শ্রীপুর, পোলঘাট, মেটিয়াবুরুজ—সব জায়গা থেকে মাংস আসছে। সে সব বাড়িতে আবার পাঠাতে হবে। মাংস পাঠানোর দায়িত্ব মইন আলি সর্দারের।

নাড়ি-ভুঁড়ি পচে এর পর দিন কতক যা গ্যাস ছড়াবে না—ইউসুফ মনে করতে পারছিল।

একটু বেলায় মাংস-পরোটা সিমাইয়ের গন্ধে সুরভিত হয়ে উঠছিল এ বাড়ির বাতাস।

হজরত বাল-হজরত বাল—ফিসফিসিয়ে কি যেন এক কথা শোনা যেতে থাকে হাওয়ায়। আয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্ডার পেরিয়ে হিন্দুরা পালিয়ে আসছে। সেখানে আর থাকতে পারবে না হিন্দুরা। এ ভাবেই নানান গুজবে ভারি হয়ে উঠছিল বাতাস।

নেপাল পান একদিন সকলকে ডেকে মিটিং করল। কুন্ডুবাবুরা ভরসা দিল—এখানকার মুসলমানদের কোনো ভয় নেই। তাদের আমরা রক্ষে করব।

সন্ধেবেলা সকালে দুপুরে নিজের রেডিওতে খবর শুনে শুনে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইছিল আয়নাল আলি মণ্ডল। দিল্লির খবর একরকম বলে। ঢাকার খবর আরেক রকম। ঢাকার খবর খুব ধীরে রেডিও চালিয়ে শুনতে হয়। চারপাশের হাওয়া গরম হয়ে উঠছে—এমনটি মনে করতে করতে বড় শ্বাসে নিজের বুক ভেঙে যাচ্ছিল আয়নালের।

নেপাল পানের বাড়ি থেকে সন্ধেবেলা মিটিং সেরে ফিরল, গওহর আলি। দুনাঅলা বামুন শিববাবু ছিলেন। নেত্র কুণ্ডু। হাসমত আলি গাজি। কাদের আলি ঢালি। গওহর আলি সর্দার দেখতে পাচ্ছিল মিটিংয়ে সবাই কেমন যেন উশখুশ করছিল। ব্যানার্জি ডাক্তার ছিলেন। পূর্ণবাবু। আয়নাল আলি মণ্ডল।

আমার বন্দুক আছে। বাইরে থেকে হামলা এলে ঠেকাব। নেপাল পান পা নাচাতে নাচাতে ভরসা দিচ্ছিল।

আমরা সবাই আছি না—নেত্র কুণ্ডু বলতে চাইছিল—ভয় কিসের! এখানকার মুসলমানদের কোনো ভয় নেই। তারা তো আর দাঙ্গা করেনি।

পূর্ণ যোগী নিজের মনে বিড়ি খেতে খেতে বলল, কি কোথায় হজরত বাল হলো—তাতে আমাদের কি! এখানে কারোর ওসব নেই।

বাইরে জানুয়ারির শীত লাগা রাত। কুয়াশার হালকা হালকা রঙ আকাশের মুখ আড়াল করে দিচ্ছিল।

নিজের গায়ে সুতির চাদর ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ডকটর ব্যানার্জি বললেন, ক-বছর আগে জব্বলপুরে যে দাঙ্গা হয়ে গেল তাতে তো মুসলমানই মরেছে। আমরা তাদের বাঁচাতে পারি নি। যাদবপুর, পাটুলি, লায়েলকা—এসব জায়গায় কাশ্মীরের 'হজরত বাল' মসজিদে রাখা হজরতের পবিত্র কেশ রহস্যজনক ভাবে চুরি যাওয়ার পর থেকেই টেনশান চলছে। যাদবপুরে মসজিদ দখল হয়েছে—

ডাক্তারবাবুর বেশি বাড়াবাড়ি—কাগজে পড়েন নি যশোর, খুলনায় কি হয়েছে—নেত্র কুণ্ডুর গলায় উত্তেজনা। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দু এপারে। মেয়েদের ইজ্জত যাচ্ছে—খুনের পর খুন। পাকিস্তানে আর কোনো হিন্দু থাকতে পারবে না।

লায়েলকা, যাদবপুর, টালিগঞ্জ, পাটুলি, বাঁশধানীর দিকে যেভাবে টেনশন হচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় এখনই বাদামতলার সামনে পুলিশ পোস্টিং—ডকটর ব্যানার্জি বলতে চাইছিলেন।

না, না—এখানে সব ঠিক আছে। আমরা সবাই ভাই ভাই—নেপাল পান হাত নেড়ে নেড়ে এটুকু বলে দিতে পারে।

তবু পুলিশ দরকার নেপালবাবু—কিছু একটা হয়ে গেলে—ডকটর ব্যানার্জি তাঁর গলায় স্থির সিদ্ধান্ত টেনে আনেন।

আমরা কোথায় যাব ডাক্তারবাবু ?

আমরা কোথায় যাব পূর্ণবাবু ?

আমরা কোথায় যাব কুন্ডুবাবু ?

আমরা কোথায় পালাব শিববাবু ?

আয়নাল আলি মণ্ডল জানতে চাইছিল। গওহর আলি সর্দার জিগ্যেস করছিল। এই শীতে তো দারুণ চাষ হয়েছে। কুমড়ো, বেগুন যাকে বলে 'মড়া' ফলেছে। মাঠ ভর্তি ফসল। কপি হয়েছে। বাঁধা, ফুল, ওল কপি। রবীন্দ্রপল্লীর বাঙালদের ছেলেরা মাঝে মাঝে আমাদের ক্ষেত থেকে কপি চুরি করে। আমরা বকাবকি করি বড় জোর। তারপর তো দুপক্ষেরই সব ঠিকঠাক চলে। এখন দাঙ্গা লাগলে আমরা কোথায় পালাব! আপনার নয় বন্দুক আছে নেপালবাবু। আমাদের ঘরে চাষের কাস্তে, হেঁসো, দা মিলবে। লাঠি বল্লমও দু-এক গাছা, কিন্তু তা দিয়ে আমরা তো মানুষ কাটতে শিখিনি। বড় জোর বাঘরোল, শেয়াল টেয়াল মারা—তাও হয় না।

এখন মাঠ ভরা চাষ। আমাদের বৎসরের কামাই—গওহর আলি সর্দার বলতে পারছিল।

না, না এখানকার মুসলমানদের কোনো ভয় নেই। পূর্ণ-যোগী বিড়ি টানতে টানতে বলছিল। আমরা এখানে বছরের পর বছর আছি। পাশাপাশি সুখে-দুঃখে। বিয়ে-থাওয়ায় নেমন্তন্ন। বিপদে-আপদে দেখা। সকলেরই জমি বাড়ি পুকুর। চাষের জমি, ভদ্রাসন। কে কোথায় যাবে! আমাদের এখানে ওসব নেই।

ডকটর ব্যানার্জি বলছিলেন, তবু আমাদের কমিটি করা দরকার, যাতে না বাইরের লোক এসে কোনো টেনশন তৈরি করতে পারে। আমরা নিজেরা নয় ঠিক আছি। কিন্তু রাতে বাইরে থেকে লোক এলে, তার জন্যে পুলিশ পোস্টিং। নিজেদের ঘাড়ে বিপদ কেন রাখি! থানায় জানিয়ে একটা পুলিশ পিকেট। আর্মড পুলিশ। নয়ত লালবাজারে বলে, যে কদিন টেনশন আছে—

দরকার কি! বলছি না, বন্দুক আছে—নেপাল পান আবারও এমনটি বলতে বলতে পা নাচায়। কিছু ইট যোগাড় কর সবাই, আধলা ইট।

তার সঙ্গে ঘরে ঘরে লংকার গঁড়ো, অ্যাসিড বালব, গরম জল, রড, লাঠি, হেঁসো--

শিবপ্রসাদের ভালো লাগছিল না নেপাল পানের কথা। দাঙ্গার সম্ভাবনা নেই বলছেন। আবার প্যানিক তৈরি করে অস্ত্র গোছাতে বলছেন—ইট, লংকার গঁড়ো—গরম জল—গোটা ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।

এই অঞ্চলে এরকম ধরনের কোনো সভাই শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে হয় না। এখানে এসেও শিববাবু তাঁর আবিষ্কার গোলা সারের কথা ভাবছিলেন। শতকরা চল্লিশ ভাগ ফলন এতে বাড়ে। খরায় ব্যবহার করা যায়।

তোমরা রাখো না সব ইটফিট যোগাড় করে। ঘরে লাঠি রাখ। গরম জল। আমার বন্দুক আছে। নেপাল পান আবারও নিজের কথাই বলছিল।

তারপর এক সময় মিটিং ভেঙে গেলে আয়নাল আলি মন্ডল, গওহর আলি সর্দার, হাসমত আলি গাজি, কাদের আলি ঢালি ফিরে আসছিল। তারা ভয়ে ছিল। সংশয়ে ছিল।

রেজ্জাক চলে গেল ঢাকা। কি ভালো অভিনয় করত। এখানে একটা সিনেমাতেও চান্স পায় নি। কি সোন্দর যাত্রা করত। নাটক। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ঘুরে ঘুরে হাল্লাক হয়ে যাওয়া। তবু কেউ কাজ দেয়নি। একটা সাইড রোল অব্দি না। মিজান আলি সর্দার বলছিল।

এখানে হিন্দুরা তাকে চান্স দেয় নি মুসলমান বলি, কে যেন পাশ থেকে ফুট কাটল।

এমনটি নানা কথা বলতে বলতে তারা নিজেদের পাড়ায় পোঁছে যায়।

আব্বা কি হবে? এমন প্রশ্নটি প্রথম করে মিজান আলি সর্দার।

গওহর আলি সর্দার কোনো জবাব দিতে পারে না।

আমরা পাকিস্তান চলে যাব। ঢাকা। মুসলমানের জন্য এদেশ নি। মিজান বলছিল। ছোট ছেলে মইন আলি সর্দার একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

আব্বা, এখানে থাকলি ভেড়া-বকরির মতো মারা যাব—তার চেয়ে পাকিস্তান—মিজান আবারও বলল।

গওহর আলি কোনো কথা বলতে পারছিল না। আমার জমি, চাষ, মাঠ ভরা ফসল। ভদ্রাসন, গোরু, ছাগল। বিছানায় চুপ করে বসেছিল গওহর আলি। রাতে খেতে বসে ভাত সামান্য নাড়াচাড়া করে এক ঘটি পানি খেয়ে তার উঠে পড়া। খিদে নেই।

বাতাসে হিম ছিল। কুয়াশার খোসা জড়িয়ে ধরছিল সমস্ত চরাচর। ইউনুসকে পাশে নিয়ে গওহর আলির ঘুম আসছিল না। ঠিক তখনই ইউসুফ আর জুবেদার মাঝখানে নিজেকে রেখে মোটা কাঁথায় সারা শরীর ঢেকে ঘুম ডাকতে চাইছিল জোবেদান বিবি। বাইরে ঘন শীত। অন্ধকারে নিথর পৃথিবী। কোথাও এতটুকুন শব্দ নেই।

আমাদের কি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে! কোথায় যাব? জোবেদান ভয় পাচ্ছিল। আমার খালাতো বোন সাহেদা, তার স্বামীর আন্ডার ব্যবসা। থাকত যাদবপুরে। সেখানে ঘর জ্বলেছে। সাহেদা তার বাচ্চারা—বাচ্চাদের আব্বা—সবাই চলে যাবে ঢাকায়। পাকিস্তানে। ওপাড়া থেকে লোক এসেছিল। তার মুখে খবর। নুনের ব্যবসা করবে। সুপুরির ব্যবসা। এদেশে আর থাকবে না।

কোথায় যেন বন্দুকের শব্দ হলো। একবার, দুবার। তাহলে কি বাইরের লোক! মাথার কাছে রাখা লাঠি হাতে বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসল গওহর আলি সর্দার। আল্লা-হো-আকবর—নারা-এ তকদির—না কি বন্দেমাতরম—কি যে চিৎকার হয়ে ভেসে আসছে বোঝা যায় না। তবু অস্পষ্ট কোলাহলে বিপদের আভাস ভাসে।

আব্বা! আব্বা! মিজান দরজা ধাক্কায়।

গওহর উঠে পড়ে। দরজার শব্দে ইউনুসও।

মিজান উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তার হাতে ধান কাটা কাস্তে—আজ রাতে একটা হেস্তনেস্ত হবে। যাদবপুর, পার্টুলি, লায়েলকা—সব জায়গায় মুসলমানের বাড়ি গেচে। যাদবপুরে মসজিদ নিয়ে নেচে বাঙালরা। সাহেদা খালাদের ঘর জ্বলেচে। জান নে পাকিস্তান পেলগে যাবে। ওখেনে আন্ডার ব্যাওসা করবে। নুনের। সুপুরির। অনেক টাকা।

দূরে আবারও কি এক হো-হো শব্দ। অনেক খ্যাপা কণ্ঠ একসঙ্গে চিৎকার করছে।

বড় ছেলের গলা পেয়ে গায়ের কাঁথা সরিয়ে নিজের ঘরের হুড়কো খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল জোবেদান। তার মনে পড়ল আজই সন্ধেবেলা কালু হাজির বাড়ি হাফেজ ডেকে কোরাণ খতমের অনুষ্ঠান ছিল। তাতে লোক হয়েছিল। কিন্তু সবার মনেই চাপা উত্তেজনা। কোরাণ খতম তেমন জমেনি।

তারপর গায়ে কাপড়ের খুঁট, কাঁথা জড়ানো কয়েকজন বিপন্ন মানুষ-মানুষী আগুনের শিখায় শিখায় শীতের আকাশ লাল হয়ে উঠতে দেখেছিল।

কার ঘর পুড়ল? গওহর নিজেকেই জিগ্যেস করছিল। উৎখাত হলো কে?

নারা-এ-তকদির, আল্লা-হো-আকবর—হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে মানুষ যেমন করে ওঠে, তেমনই করে উঠছিল মিজান। একবার, দুবার—

আয়নাল আলি মণ্ডল ছুটে এলো। হাতে লণ্ঠন। লাঠি। কি, কি হলো! আয়নাল জানতে চাইল।

সে কথায় তখনই কোনো জবাব না দিয়ে—চুপ মার। চুপ কর। বলতে বলতে গওহর নিজের বড়খোকাটিকে সামাল দিল।

কি হয়েছে? কোনো বিপদ! আয়নাল আবারও জানতে চাইল।

আবারও বন্দুকের শব্দ।

দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কোলাহল। আগুনের রঙে লাল হয়ে ওঠা আকাশ।

গওহর আলি সর্দারের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে এ পাড়ার বিপন্ন, অসহায় কয়েকজন মানুষ। তাদের প্রশ্ন - দাঙ্গা লেগে গেলে আমরা এখন কি করব!

আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ। আসমান থেকে হিম নামছে। বাতাসে শীত।

আয়নাল আলি মণ্ডলের লণ্ঠনের আলো মাটিতে যেটুকু জায়গায় পড়েছে, সেখানে একটা দগদগে লাল ছ্যাঁকা খাওয়া দাগ।

বিছানা ছেড়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে উঠে এসেছে জোবেদান। পাশে কাঁথায় মোড়া জুবেদা ইউসুফ। কোনো রাত-চরা প্যাঁচা আকাশ চিরে ডাকতে ডাকতে রেনিয়ার বাদার দিকে উড়ে গেল।

কুয়াশার আড়ালে অল্প দূরে মা, চাচিমা, ছোটবুবু—ঘুমলাগা চোখে ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল! তার দু'কাঁধে তখনও দুজন ফেরেশতা কেরামিন আর কাতেমিন। শেষ রাতের এই অন্ধকারে ফেরেশতারা কি উড়ে যাবে দূরের আগুন লাগা বাড়ির মানুষদের দিকে! কিন্তু তাদের সবার কাঁধেই তো কেরামিন আর কাতেমিন। শেষ রাতের এই হিম কুয়াশা মাখা অন্ধকারে ইউসুফ এত সব কিছু বুঝতে পারছিল না।

সব মানুষের কাঁধেই তো ফেরেশতারা আছে। তাহলে কেন ঘর জ্বলে

যায়! ইউসুফ এমন প্রশ্ন নিজেকে করতে পারল না। কেরামিন কাতেমিন যখন দু কাঁধে, তখন আমার আর ভাবনা কি—ইউসুফ নিজেকে নিজে শোনাচ্ছিল।

কেউ কোনো কথা বলতে পারছিল না। সে রাতে আর ঘুম এলো না কারও চোখে।

তারপর ভোর হয়ে গেলে সারা রাত প্রায় জেগে থাকার ক্লান্তিতে তারা কেউ কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে চাইলেও এইবার আমাদের কী হবে, এই আতঙ্কে উঠে পড়তে হয়।

চলো, নিমাই পানের বাড়ি। ডাকো নেত্র কুণ্ডু, পূর্ণবাবুকে। শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যানার্জি ডাক্তার, হাসমত আলি গাজি, কাদের আলি ঢালি সকলেই দুশ্চিন্তায়।

দল বেঁধে, ভয় আর তার সঙ্গে অনেকটা আশা নিয়ে তারা নিমাইবাবুদের বাড়ি পোঁছে যায়। সামনে বড় উঠোন। শিব মন্দির। তারপর উঁচু রোয়াক। মোটা মোটা থাম। নিমাই পান রোয়াকের ওপর। সবাই দেখতে পেল এত সকালে ব্যানার্জিবাবুও এসেছেন।

আমাদের কি হবে বাবু! আমরা কেথায় যাব বাবু! আমাদের বাঁচান।

এমন সব কথা নানান গলায় উঠে আসতে আসতে মিশে যাচ্ছিল এ বাড়ির বাতাসে।

মনে হয় আর বাঁচানো গেল না। এবার তোমাদের নিজেদেরই নিজে দেখতে হবে। নিমাই পান পা নাচাতে নাচাতে বলছিল।

সবাই চুপ।

কাল সারারাত ছাদে পাহারা দিয়েছি। যতবার বাইরের দাঙ্গাবাজরা তেড়ে এসেছে, বন্দুক ছুঁড়ে ভাগিয়েছি। আমার বড় পুকুরে নৌকো নিয়ে একদল লোক—আমার বাড়ি পর্যন্ত আক্রমণ করতে চায়—নেহাৎ বন্দুক ছিল—এত লোকের জিম্মেদারি নিতে আমি ভয় পাচ্ছি বাবা। শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হয়—একটা ঘটনা ঘটে গেলে—

আসুন না, আমরা থানায় একটা খবর দি।

ব্যানার্জিবাবু কালকের সুরেই বলছিলেন।—পুলিশ পিকেট হোক। মানুষ অন্তত নিজেদের নিরাপত্তাটুকু ফিরে পাবে। বিশ্বাস যা যাওয়ার,

সে তো গেছেই। আর আমরা সবাই মিলে একটা কমিটি, গোটা এলাকা পাহারার জন্যে ছেলেপুলে যোগাড় করে, চাঁদা তুলে টর্চ, লাঠি কিনে—

রাতে টেনশান বাড়বে। নেপাল পানের পা কথা বলার সময় নাচতেই থাকে।—বাড়ির সামনে ইট যোগাড় করে রাখুক সবাই। যেমন আমি রেখেছি। গরম জল। লঙ্কার গুঁড়ো। ওহ হো—কাল সারা রাত ছাদে পায়চারি করে গা-হাত ব্যথা হয়ে গেছে। জ্বর না আসে! বলতে বলতে নেপাল পান গা মোড়ামুড়ি দিল।

শিববাবু বললেন, সেরকম হলে আমার বাড়ি তো আছেই। চলে আসবে সব।

পূর্ণ যোগী বলল, এখনই বাড়ি ছেড়ে না গিয়ে দেখই না সব।

জমি, ভদ্রাসন, খ্যাতের কুমড়ো বেগুন—এত জমি, চাষ, ভদ্রাসন বলেই তো সমস্যা—ডকটর ব্যানার্জি নিজেকেই নিজে শোনাচ্ছিলেন। একটু ভয় দেখিয়ে মুসলমানের জমি কেড়ে নিয়ে, তাকে উৎখাত করে বসে যেতে পারলেই তো ঘর, বাস্তু-জমি আমার। ভয়ে মুসলমান পালাচ্ছে, দূরে—আরও দূরে—আমরা দখল নিচ্ছি—উদ্বাস্তু কলোনি থেকে বন্দেমাতরম, কালি মাঈকি জয় বলতে বলতে ছুটে আনছে দাঙ্গাবাজরা। হাতে দা-সড়কি, লাঠি, তলোয়ার, কেরোসিনের টিন। ঘর জ্বলছে। খুন হচ্ছে।

ডকটর ব্যানার্জি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, তিনি আজ লালবাজারে ফোন করবেন।

সভা ভেঙে গেল। মাথা নিচু করে ফিরে আসছিল আয়নাল আলি মণ্ডল, গওহর আলি সর্দার, কাদের আলি ঢালি, হাসমত আলি গাজি। তারা দেখতে পেল নিমাই পানের বাড়ির সামনে তখন স্তূপ করা আধলা ইটের টুকরো।

সারা দুপুর গুজব। বাঁশধানীতে মোল্লাদের মেরে তাড়াচ্ছে। যাদবপুর, লায়েলকা, টালিগঞ্জে এক ঘর মুসলমানও নেই।

দোলায় শোয়া ইদ্রিস কাঁদতে ভুলেছে। গোয়ালে বাঁধা গোরু হামলায় না। মোতালেব ইউসুফ চুপ। রাতে কী হবে, রাতে কী হবে—সবাই এমন একটা আতঙ্কে ছিল।

শীতের আকাশ ছিল নীল কাচ রঙের। হিম ছোঁয়া বাতাস বইছিল। কাঁটা দিয়ে উঠছিল সকলের গায়ে।

ক্লান্তি, আতঙ্ক, বিপন্নতা—আয়নাল বলছিল, আমরা নতুনহাট চলে যাব—সেখানে আমার শ্বশুরবাড়ি। জান, মাল দুটো যাওয়ার থেকে জান বাঁচুক—জান বাঁচলে পরে আবার সব ঠিকঠাক—

কেউ কেউ আরও দূরে - খড়িবেড়ে, ভাসা, আমতলা চলে যেতে চাইছিল। সেখানে সবাই কওমের মানুষ, মুসলমান। 'বাঙালি' বস্তি নেই। বাঙাল কলোনি নেই। পুজালি, বজবজ, বাটা—নিজের আত্মীয়ের কাছে চলে যাব আমরা—এমনও বলছিল অনেকে।

বাটাতেও গোলমাল। মুসলমান পালাচ্ছে—বাতাসে গুজব ভাসছিল।

আমি তো ঢাকা চলে যাব। পাকিস্তান। নিজের কওমের কাছাকাছি। ব্যাওসা করব—নুন, সুপুরি, গোরু—অনেক টাকা। মিজান আলি সর্দার নিজের মনে বলছিল।

খানিকক্ষণ আগে দিল্লির খবর হয়ে গেছে। আকাশবাণী···এখন খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল ···আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো···

আয়নাল কান খাড়া করে শুনছিল। তার ঘরে আরও কেউ কেউ। নাহ, দিল্লি থেকে ভেসে আসা খবরে কিছু নেই। অথচ আধ ঘণ্টা পরে কাঁটা সরিয়ে ঢাকার খবর শুনে নিলে মুসলমানদের ওপর হিন্দুস্থানে কতখানি অবিচার, অত্যাচার হচ্ছে—তার একটা আস্ত ছবি ফুটে ওঠে।

দিল্লির খবরে যশোর, খুলনা ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে হিন্দু শরণার্থী আসছে—এমনটি শোনা গেল—এইমাত্র। ঢাকার খবরে নদীয়া, ২৪ পরগনা, বিহারের মুসলমান দলে দলে জান হাতে নিয়ে, মাল ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে—এমনও শুনতে পাচ্ছিল আয়নাল। কোনটা সত্যি, কোনটা! আয়নাল বুঝতে পারছিল না।

সকালের হাওয়া শীত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। রেনিয়ার দিকে বাদায়, জলাতে বুনো হাঁস নেমেছে। একটা বন্দুক হলে এখন ভালো শিকার—মইন নিজের মনে ভাবছিল। তখনই ইউনুস ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—আমাদের খ্যাতের কপি বাঙালরা কেটে নে যাচ্ছে। ইউনুস হাঁপাচ্ছিল।

তবে রে শালা—বলে চিক্কুর পেড়ে লাফ দিয়ে নামতে চাইছিল মইন আলি সর্দার। একটু দূরে লাঠি হাতে মিজান—চল তো দেখি, চল···কোন—সুমুদ্দির ব্যাটা

গওহর আলি সর্দার তার উত্তেজিত দুই ছেলেকে থামাতে চাইছিল।
—চুপ যা, চুপ যা বাপ—

তাই বলে কলোনির চ্যাংড়ারা—ভয় পেয়ে যাব—মোল্লারা এত ভিতু—মিজান চিৎকার করে উঠছিল।

আব্বা—আমাদের মাঠ ভরা কপি, কুমড়ো, বেগুন—সব তো নে যাবে—

যাক—জান থাকলি মাল হবে। এখন তোরা গেলেই কাজিয়া—গওহর স্থির বুদ্ধিতে দুই ছেলেকে থামাচ্ছিল।

দুপুরে ভাত খেতে বসে গওহর আলি বলল, ক-দিনের জন্যে আমরা নতুন-হাট চলে যাব। শুনতে শুনতে গলার ভাত আটকে আসছিল ইউসুফের। ইউসুফ জানে সেখানে দাদির চাচা থাকে।

ওখানে চারপাশে সবাই মুসলমান—মিজান মাথা নিচু করে বলছিল।

দুপুরে ভাতে বসে গওহর আলি সর্দারের কথা মনে করতে করতে বারে বারে গলার ভাত আটকে যাচ্ছিল জোবেদানের। পানিও ঠেকে যাচ্ছিল গলায়। একটা কান্নার সুতো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল বাইরে। আমাদের জমি, ভদ্রাসন, কাঁঠাল গাছ, গোরুব গোয়াল, মুরগির খোঁয়াড়, ছাগল, মুরগি, হাঁসো, পুকুর, নারকেল গাছ, খেজুর গাছ, মাটির দলিজ আর ব্রহ্মপুরের এই আকাশ—সব পড়ে থাকবে। সব।

ছোলার ডাল-মাখা ভাতের সঙ্গে চোখের জলের নুন মিশে যাচ্ছিল। সেই ধারা হাতের উল্টো পিঠে মুছে গালের চামড়ায় মিশিয়ে দিতে পারছিল না জোবেদান। তার জানা ছিল মানুষটি যখন একবার বলেছে, তখন যাবেই—

বিকেল বিকেল বাঁধাবাঁধি হয়ে গেল। আয়নাল আলি মণ্ডলরা যাবে খড়িবেড়ে। গওহর আলিরা নতুনহাট। এবাড়িতে জোবেদান থাকবে। সঙ্গে ইউসুফ।

ফেণিবিবি, মিজান আলি সর্দারের কিছু বলার নেই। আব্বা বলেছে।

সন্ধের দিকে আবারও আকাশ লাল। আগুন, ধোঁয়া। অস্পষ্ট কোলাহল।

'বন্দেমাতরম' 'কালী মাঈ কি জয়' না 'আল্লাহো আকবর' বোঝা যায় না। নিমাই পানের ছাদ থেকে বন্দুকের শব্দ। আয়নাল আলি মণ্ডল, গওহর আলি সর্দার চলে যাচ্ছে। সঙ্গে তাদের বাড়ির মেয়েরা, ছেলেরা—

যাওয়ার আগে তারা দুজনেই ভিটের দিকে তাকিয়েছিল। আয়নাল ভাবছিল আমার এত মোষ, ভদ্রাসন, জমি—ক্ষেত ভরা কুমড়ো, বেগুন, কপি—সব ফেলে—আব্বার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। আর কি কোনো দিন ফিরে আসতে পারব ? চোখে জল আসছিল আয়নালের।

এই তো কদিন আগে কোরবানির জন্যে আমরা গো-হাটা থেকে গোরু হাঁটিয়ে আনলাম। ইউসুফের মনে পড়ছিল হাট ছেড়ে আসার আগে গোরুটি পেছনে তাকিয়েছিল একবার। হয়ত আরও একবারও। আমরা তার পিঠে পাঁচন বাড়ির ঘা দিলাম

আমার দাদু, আব্বা বার বার ভিটের দিকে তাকাচ্ছে—ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল।

একটি শীতমাখা অন্ধকার রাত ব্রহ্মপুর বাদামতলার ওপর আছড়ে পড়ল। ঠিক তখনই নিজের গড়িয়ার ডিসপেনসারি থেকে ডকটর ব্যানার্জি বারবার ফোন করার চেষ্টা করছিলেন—লালবাজার, হ্যালো লালবাজার, লালবাজার…

এবাড়িতে কেউ নেই আমি আর আমার এই নাতিটা ছাড়া। পাড়ার সবাই পেলগেছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে, জান বাঁচাতে—দূরে। আরও দূরে কওমের কাছে। খালি এক আয়নালের মা—তা সে বুড়ি তো নড়তে চড়তে পারে তবু। নিজেরটা নিজে বোঝে।

শীতের চাঁদ কুয়াশা ছিঁড়ে জ্যোৎস্নার মায়াবী ধারা পৌঁছে দিচ্ছিল পৃথিবীতে। এমন গোলমালের কদিন কার্তিক চৌকিদারের গলার স্বরও পাওয়া যায় না।

কার্তিক কি আছে, না পালিয়েছে ! আহা, ওর ছেলেটারে বাঘরোল নে গেল, কদিন আগে—জোবেদান মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল। চৌকিদার থাকলেও না হয় ভরসা একটু। ভাবতে ভাবতে বিছানায় জোবেদান জেগে থাকে। কান

খাড়া করে থাকে। ভয়—ঠান্ডা—সে যেন এক খন্বিশ বরফ—জোবেদান টের পায়।

পাশে কাঁথা চাপা ইউসুফ—ঘুমোয়নি। শীতের বাতাস বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর। জোবেদানের শীত লাগে। দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি এসে যায়।

এ পাড়ায় কেউ নেই। সব বাড়িরই কপাট প্রায় বন্ধ। খালি বাদামতলা মসজিদে ইমাম সাহেব সময় ধরে ধরে আজান দেয়। ফজর, জোহর, আশর, মগরেব, এশা। নিয়ম করে ঘড়ি ধরা আজান বাতাসে মিশে যায় কিন্তু মসজিদে যাওয়ার লোক নেই। দু-এক জন প্রায় পেকে আসা মাথা আর বুড়োবুড়ি, বাচ্চা বাদে জোয়ান মানুষ দেখা যায় না।

ইউসুফ সকালে রাস্তায় আসে। চারপাশ ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। কয়েকবার এদিক ওদিক দেখে এক ছুটে অনেকটা দৌড়ে পশ্চিমপাড়ায় চলে যেতে চায়।

শেখপাড়া, পশ্চিমপাড়া সব যেন কবরস্তান। শুনশান, কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা ফাঁকা মাটির বাড়ি। খড়ের চাল। নিম গাছ, পলতে মাদার, বাঁশঝাড়, বাতাবি লেবু, কাঁঠাল গাছ, নারকেলের সারি।

পশ্চিমপাড়ায় কাঁচা মাটির বাড়ির গায়ে আগুনের কালচে স্মৃতি, খড়ের চাল পুড়েছে। জিনিসপত্র লন্ডভন্ড। উঠোনে ভাঙা চৌকির পায়া। আধপোড়া বিছানা, কাঁথা, বালিশ। আধপোড়া খড়, পাটকাঠি।

শুকনো খড়, পাটকাঠি—আগুন যারা লাগাতে চেয়েছে তাদের কোনো অসুবিধে হয়নি।

মাথায় করে খড় নে যাচ্ছে, রবীন্দ্রপল্লী, বাঙালপাড়া, নাথপাড়ার ছেলেরা। সঙ্গে পাটকাঠির বোঝা—মোল্লাবাড়ি থেকে যা যা পাওয়া যায়, মন্দ কি! এদের অনেককেই চেনে ইউসুফ।

পশ্চিমপাড়ার এই গোয়ালঘরের ভেতর থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে ইউসুফ দেখতে পাচ্ছিল—খড় লুট হচ্ছে। পাটকাঠির বোঝা নিয়ে যাচ্ছে।

গোয়ালঘরে গোরু নেই। তার চাল পুড়েছে। ভেতরে এখনও খড়পোড়া গন্ধ।

দম আটকে আসতে চায়। মাটিতে আগুন লাগলে যেমন গন্ধ ছড়ায়,

তেমন গন্ধ, প্যাঁকাটি জ্বলা ঘ্রাণ। খড়ের চালে তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে ওঠা আগুনে—পোড়া বাঁশের গায়ে যতটুকু খড়, সেটুকুই মাথার ওপরে।

ঘরের বিছন, নোংরা তেলচিট বালিশ, দু একটা জামা-কাপড় কাঁথা—সব ছড়ানো—আগুনে খেয়ে জায়গায় জায়গায় কালো। উঠোনে সেইসব আধপোড়া জিনিসের ওপর একটা দলছুট কাক। সাহসী শালিক একটা-দুটো—এক পাশে।

গোয়ালের মাটির মেঝেতে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর, খড়পোড়া ঘরের ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট, পরিষ্কার গোল একখানা আকাশ চোখে পড়ে। হঠাৎ সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকখানা ধক্ করে নড়ে ওঠে ইউসুফের। শীতের এই আকাশে মেঘ নেই। খালি রোদ হাসে। সেখানে উড়ে বেড়ায় শকুন, চিল। ঘোরে, পাক খায়।

ঘরের মাথায় ছাদ না থাকলে এমন করে আকাশ দেখা যায় ইউসুফের জানা ছিল না। মাথার ওপর নীল গোল আসমান, ঠিক গোল নয়, ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে পোড়া খড়ের দাগ লাগা একখানা আকাশ। ইউসুফ মাথা নিচু করে নিল। আর খুব চাপা খস খস শব্দে একটু চমকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল গোইলের জাবগর্তে পাশাপাশি, জড়ামরি করে বসে থাকা মুরগি—তিন-চারটে, জ্যান্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি মরে গেছে। যারা ঘরে আগুন দিয়েছে, লুঠ করেছে তারা নিশ্চয়ই দেখতে পায় নি।

গোয়ালের হা-হা খোলা ঢোকার জায়গা, তার পাশে দেয়ালের আড়াল—সেখানে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল ইউসুফ। এই খণ্ডহরের ভেতর তার কানের পাশ দিয়ে শুধু একটি চড়াই ডানা ঝাপটে উড়ে গেল দূরে।

গোয়ালে গোবর চোনা, পোড়া খড়, দগ্ধ প্যাঁকাটির গন্ধ মেশান ভারি বাতাস। রবীন্দ্রপল্লী, নাথপাড়া, কলোনির ছেলেরা এক হাতে মুরগি ঝুলিয়ে, অন্য- হাতে খড়, পাটকাঠি ঠ্যালা গাড়িতে তুলে ফিরছে।

ইউসুফ নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। তারপর ওরা চলে গেলে, অনেকক্ষণ পর নিশ্চিন্ত হয়ে বেরবার সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে—বিপদ নেই, এ ব্যাপারটাতে নিশ্চিত হয়ে সে বাড়ির পথে ছোটে। দাদির কাছে। আর খানিকটা এসে রাস্তার ওপর দুটো কাঁচা বেল কুড়িয়ে পায় ইউসুফ। কেউ শেখপাড়া থেকে লুঠ সেরে ফেরার পথে ফেলে গেছে। নিয়ে যেতে পারে নি। ইউসুফ তুলে নেয়।

তারপর বাড়ির কাছে এসে মোতালেবদের দলিজের সামনে চৌকি পেতে চারজন খাকী পোশাকের পুলিশকে গল্প করতে দেখে ইউসুফ। তাদের মাথায় লাল টুপি। কাঁধে ঝকঝকে পেতলের ব্যাজ। কাঁধে রাইফেল। হাতে লাঠি। পুলিশরা গল্প করে। হাসে। সিগারেট খায়। ইউসুফ কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে দেখে। তারপর একসময় ঘরে ঢুকে যেতে গেলে তাকেও দেখে ফেলে পুলিশদের একজন।

অ্যাই খোকা, অ্যাই খোকা—

ইউসুফ প্রথমটায় শুনতে পায় না। তারপর এগিয়ে এসে ভীরু চোখে তাকালে—অ্যাই তোকে বলছি—তুমকো, তুমকো বোলতা—বলে তাকে কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকলে না গিয়ে উপায় থাকে না।

পুলিশ, নির্ঘাৎ আমায় ধরবে। ইউসুফের প্যাণ্টে হিসি পড়ে যায়।

অ্যাই, তুই এখানে থাকিস ?

মাথা নিচু ইউসুফ ঘাড় নাড়ে।

মুসলমান ?

ইউসুফ মাথা নামিয়ে ঘাড় নাড়ে।

মুরগি, মুরগি খাওয়াতে পারিস—তোদের বাড়ি তো মুরগি থাকে।

ইউসুফ চুপ।

বল। আরে বল না। মোল্লাদের বাড়ি তো মুরগি থাকে—

ইউসুফ বুঝতে পারে তার প্যাণ্ট ভিজে যাচ্ছে।

শালা, মোল্লাদের বাড়ি মুরগি নেই। রায়ট লেগেছে, আমরা পাহারা দেব রাত জেগে—আর মুরগির বেলা—একজন রাইফেলধারী হাফপ্যাণ্ট গজগজ করে করতে করতে হাই তোলে। তারপর সিগারেট ধরায়। টানে। ধোঁয়া বাতাসে মিশিয়ে দিতে দিতে বলে, তোরা এখানে আছিস কেন ? চলে যা। তালে আর পাহারা দিতে হবে না। রাত ডিউটি, টেনশন। আর পারা যায় না। আবারও হাই তোলে কাঁধে রাইফেল। তারপর চৌকির ওপর পা তুলে বলে, যা ভাগ—দ্যাখ যদি মুরগি আনতে পারিস তো—

ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে ইউসুফ দেখতে পায় মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাদি কোরাণ পড়ছে। মুখ পশ্চিমে, দরজার দিকে পিঠ। কোরাণশরিফ রাখা কাঠের রেহেলে। দাদি স্থির।

আমার প্যাণ্টে ভয়ের পেসাব। এখনই গা ধোয়া দরকার। নইলে ঘরে

ঢোকা যাবে না—এমন ভাবনার ভেতর ইউসুফ সোজা গিয়ে পুকুরে ঝাঁপায়। ডুব দেয়। ভেসে ওঠে। ডোবে।

মোতালেবদের দলিজের সামনে কাঠের চৌকিতে বসা চারজন পুলিশ তা দেখে দাঁত বার করে।

ঠিক তখনই নিজের বাড়ির হাতার ভেতর ঘরছাড়া উৎখাত, ভয় পাওয়া মুসলমানদের ঠিকঠাক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরপোড়া মানুষ আশ্রয় নিয়েছে আমার বাড়ি, শিববাবু ভাবছিলেন। তাদের পাশে না দাঁড়ালে—

বড় অ্যালুমিনিয়ামের গামলার ভেতর মুড়ি, শশার টুকরো। সবাই হাতে হাতে খাচ্ছিল। পাশে দাঁড়ান শিববাবুর স্ত্রী—

দক্ষিণ কলকাতা কৃষক সমিতির ছেলেরা অনেকেই জড়ো হয়েছে। শিববাবু বলছিলেন, ভাগ্যিস ডাক্তারবাবু লালবাজারে ফোন করেছিলেন, তাইতো আয়নালদের দলিজে আজ সকাল থেকে পুলিশের ব্যবস্থা—। খানিকটা নিশ্চিন্দি। ব্যানার্জিবাবুর ওখানে ফোন ছিল তাই, নইলে—বলতে বলতে শিববাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

তখনই মোতালেবদের দলিজের সামনে খাকী পোশাক পরা চারজন হাসতে হাসতে, হেসে গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে ইউসুফকে ল্যাংটো করে দিতে চাইছিল।

অ্যাই, মোল্লার ছেলে ন্যাংটো হ—তোর তো কাটা, দেখি— তোর তো কাটা—আরে, ইসে নাঙ্গা কর দো—শালা মুরগা নেই লাতা হ্যায়। মুরগা নেই লাতা—

ইউসুফ ভয়ে চিৎকার করে কাঁদতেও পারছিল না। ভিজে প্যান্টের দড়ি খুলে দিচ্ছিল কর্কশ, পুরুষ-হাত। হাতগুলি।

কেন জানিনা এখনই, অনেক দিন পর আবারও বেচু হাজামকে মনে পড়ে যাচ্ছিল ইউসুফের। সেই ময়লা হয়ে যাওয়া শাদা টুপি। পান-জর্দায় কালচে হয়ে আসা দাঁতের পাটি। বাঁশের চ্যাঁচারি, যন্ত্রণা—ইউসুফ কেঁদে ফেলল।

দাদি, আমি তোমায় বেল দুটো পোড়াতে বলব ভেবেছিলাম। ভাত

খেতে বসে ইউসুফের চোখে জল আসছিল। আজ চুলো জ্বলে নি। পান্তা ভাত। সঙ্গে কাঁচা পেয়াজ। এক চিমটে নুন। কালকের বাসি তরকারি। ইউসুফের চোখে পানি কাটছিল।

গোয়ালের ছ-ছটা গোরু, এতবড় ভদ্রাসন, কাঁঠাল ও নারকেল গাছ। জমির চাষ, হাঁস-মুরগি—সব আমার ওপর ফেলে দিয়ে চলে গেল। এত কে দেখবে। সামলাবে! তোমারা সবাই নতুনহাটে, আমার চাচার বাড়ি। আমি একলা - জোনানা মানুষ। আল্লার ভরসায়। হে আল্লা, সবাইরে দেকো। ভালো রেকো। খুশ-কিসমত রেকো—জোবেদান ভাতের দলা গালের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে মনে মনে বলছিল।

পুলিশ কি এখন থাকবে দাদি? ইউসুফ ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করছিল।

হ্যাঁ, থাকবে তো। পুলিশ তো ভালো—জোবেদান বলছিল।

মাথা নিচু করা ইউসুফ কিছু বলতে পারছিল না। শীতের ছোট বেলা বড় তাড়াতাড়ি মুছে যায়।

খেয়ে উঠে জোবেদান টুকটাক হাতের কাজ সেরে নিচ্ছিল।

একপাক টহল দিয়ে ঘুরে আসা পুলিশরা বসেছিল চৌকিতে। রাতে তারা দু-এক পাক গার্ড দিয়ে শোবে আয়নাল মণ্ডলদের দলিজের পাশে ছোট ঘরটিতে।

ঘুমের ভেতর, হয়ত ঠিক ঘুম নয়, সেই মুণ্ডু মুছে যাওয়া খাকী উর্দিরা হেসে উঠলে ইউসুফের প্রাণ উড়ে যায়। এই তো কদিন আগেই, ঈদের সকালে ঐ কাঠের ভারি সিন্দুকের গভীর হাতড়ে লাল রঙের হাত দুয়েক লম্বা বাক্সের ভেতর থেকে জরি বসানো, চিকনের কাজ করা টুপি বের করে ছিল দাদি। যেমন প্রতি বছর রোজার ঈদের সময়। কোরবানির ঈদে। আমরা সবাই সেই টুপি পাঞ্জাবি পবে বাদামতলা মসজিদে। বাঁশের গেটে রঙিন কাগজের শিকলি, দেবদারু পাতা দোল খাচ্ছিল হাওয়ায়। গলা মেলালাম। নামাজের পর বুকে বুক লাগানোতে কি যে আনন্দ।

আবারও মুণ্ডু না থাকা উর্দিরা প্যান্ট খুলতে চাইছিল ইউসুফের। এমন ভাবতেই বারবার শিউরে ওঠা। এমন কি চ্যাটি-কাটানির সকালে বাড়িতে মিলাদের স্বর ছড়িয়ে পড়তে থাকলে, গ্লাসে গ্লাসে রঙিন শরবতের আপ্যায়নে, ফুলের মালায় বেচু হাজামের পান-জর্দার কালিতে ময়লা হয়ে থাকা

দাঁত ও বাঁশের চ্যাঁচারির ব্যথা—সবই ইউসুফ মনে করতে পারল—দুটো ছবি জড়িয়ে যাচ্ছিল এক সঙ্গে।

সেই প্রাচীন সিন্দুকটি ঘরের কোণে, তেমনই অনড়। যেন কোনো বুড়ো গোরু—তার গায়ের যে কারুকাজ, সে সবই এই আধো-আঁধারে মুছে গেছে। গড়ানোর চাকা ডুবে আছে মাটির মেঝের ভেতর। এই সিন্দুকের পেছনে আমি লুকোতে পারি ইস্কুল যাওয়ার ভয়ে, গোরু নেড়ে দেয়ার চাপে। সিন্দুকের মাথায় উঠে বসলে দাদি মুখ ঝাড়া দেয়। মা বকে। আব্বা চ্যাঁচায়।

এখন কেউ বলার নেই।

দাদি শুধু গা ধুয়ে কোরাণ পড়ে। চোখ দিয়ে পানির ধারা। ঠিক মতো রান্না হয় না। কোনো রকমে কিছু একটা, দুটো পেট ভরানোর জন্যে।

অন্ধকারে সিন্দুক তেমনই দাঁড়িয়ে।

আহা, আমার দু কাঁধে কেরামিন কাতেমিন। ফেরেশতারা কি এইসব পুলিশদের কাঁধেও, যারা আমায় ন্যাংটো করে! গওহর আলি সর্দারের ঘরে, যেখানে এখনও দাদা ইউনুসের গন্ধ, সেই বিছানায় আমি আর দাদি। এঘরে সিন্দুক। ঐ তো অন্ধকার কোণে স্থির, জবর-জং। আহা, সিন্দুকের যদি পাখা হতো, যেমন ফেরেশতাদের পিঠের ওপর। জ্যোৎস্না রঙের ডানা গজিয়ে ওঠা সিন্দুক যদি উড়তে উড়তে চলে যায়, দূরে, যেখানে এখন সবাই। তাহলে তো বাঙালপাড়ার ছেলেরা এসে লুটপাট, আগুন দিতে পারে না—দাদি ভয়ে থাকে।

আর সিন্দুকটি তখনই উড়ে যেতে থাকে ডানা মেলে ঐ দূর আসমানে। দিঘির পাড়ের চারটি তালগাছ, পোঁষিদের ঘর পেরিয়ে, দিঘির জলে তার ছায়া পড়ে না।

জোবেদান তার নাতিটিকে নিজের বুকের কাছে নিয়ে এসে ঘুমোতে চাইছিল। কিন্তু তারও তো স্বপ্ন থাকে। আর সব স্বপ্নই তো আলাদা রকম। জোবেদান মোতালেবদের সেই প্রাচীন দলিজ-ঘরটি, যার কপালে শ্বেতপাথরের ফলকে বাংলায় ৭৮৬, আশরাফ ভবন—এই সব লেখা, তার

সামনে অনেক লোক দেখতে পাচ্ছিল। কি এক উৎসব যেন। হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্সের আলো। হাওয়ায় কেরোসিন, পোড়া কার্বাইডের গন্ধ।

কত মানুষ। খাওয়া-দাওয়া। লোকজনের গলার স্বর। খানাবাড়ির ভিড়ে কষা মাংসের ঘ্রাণ। পেঁয়াজ-রসুন, ছোলার ডাল, নারকেল দুধে সিমাই ফুটে ওঠার গন্ধ। কি উৎসব? শাদি, খত্‌না, আকিকা, মুখেভাত—কার? ঘুমের মধ্যে জোবেদান উত্তর খুঁজছিল।

দলিজ-ঘরের কোথাও বট-অশ্বত্থের চারা নেই। ফাটল, নোনা—কিছু নেই। সব কেমন নতুন, ঝকঝকে। প্রজারা এসেছে দূর দূর থেকে ধান নিয়ে। বাতাসে নবীন ধানের গন্ধ। এক স্বপ্ন অন্য স্বপ্নের ভেতর মিশে যাচ্ছে—জোবেদান টের পাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই।

তারপর সেই আস্ত দলিজ-ঘরটি পাখা মেলে উড়ে গেলে পড়ে থাকে শুধুই ফাঁকা মাঠ। জোবেদানের বুক ধক ধক করে ওঠে। সেই শুনশান ময়দানে কেবল আগুন জেগে থাকে। জাহান্নামের আগুন। আর বন্দেমাতরম। আল্লা হো আকবর।

ডানা ঝাপটানো সিন্দুক আর দলিজ-ঘর কি শূন্যে একসঙ্গে মিশে যেতে পারে? জোবেদান বুঝতে পারে না।

এগারো

কতদিন আসে না সেই কেরোসিন তেলঅলা ছেলেটি। যার সোনা বাঁধানো দাঁতে এক টুকরো সূর্য আটকে যায়। পাঁট মেপে তেল দিতে দিতে তার হাসি। জোবেদান মনে করতে পারে। মাটির দেয়ালে আঙুল দিয়ে কাটা সেই সব চুনের দাগ, যা আসলে পয়সার হিসেব, তাও তো রোদে-জলে একটু ময়লা মতো, আবছা। এরপর তো ঘর অন্ধকার থাকবে।

সেই আঁধারে গোদা গোদা ভূতেরা—ইউসুফ আতঙ্কে থাকে।

সেই রূপবতী হলুদ শাড়ি পরা চুড়িওয়ালি, সাজিমাটিঅলা—সকলেই কোন নিরুদ্দেশে। ইউসুফ ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে করতে পারে।

চুড়িওয়ালির হাসির সঙ্গে জোবেদানবিবি, ফেণিবিবির হাসিও মিশে যেত।

গোইলে গোরু হামলালে জোবেদান নড়ে ওঠে। গোরুকে কিছু তো দিতে হয়। খোঁটা বাঁধা, অবোলা জীব। পোষা ছাগল খোঁয়াড়ের হাঁস-মুরগিরা, তারাও খাবার চায়। এবাড়ির পোষা বেড়াল। সে-ও ভাত, মাছের কাঁটা খোঁজে।

দিন রাত সব যেন সমান আমার কাছে। মোতালেবদের দলিজ-ঘর রোদ মেখে একা একা দাঁড়িয়ে। তার পাশে পুলিশ - আমার আর ওদিকে যেতে ইচ্ছে হয় না—ইউসুফ মনে মনে ভাবে।

শুধু সিন্দুকটি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মাটিতে বসে যাওয়া পায়ায়, ভারি ডালায় চোরা আলো এসে পড়লে একেবারেই বদলে যায় চেহারা। এমন কি আগের রাতে ডানা ঝাপটে আসমানে ছুন্নি হয়ে যাবার পর চাঁদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে নেমে এলে তার রঙও বদলে গেছিল ইউসুফের স্বপ্নে। আর এখন সেই স্থির সিন্দুকটি কথা বলে—

ও এচুপ, বাপ আমার, বাঙালরা এলি আমার ভেতর নুকুবি।

ডালা তুলে ? অত ভারি ডালা তো আমি তুলতে পারি না সিন্দুকদাদা

সে হবে একন। আল্লার কুদরতে সব হয়। ও ডালা আপনিই খুলে যাবে। তুই সামনে দাঁড়াবি।

ডালা খোললে হবে কি ? ভেতরে তো বাসন কোসন। ঈদের টুপি। পায়ের চাপে সব ভাঙবে। কপালে পেটন আছে দাদির হাতে। আব্বা ঝানতি পারলি গোরু পেটানর পাঁচন বাড়ি দে

কিছু হবে না। সে সব আমি দেখবখন।

একা ঘরে সিন্দুক জিন্দা হয়ে ওঠে। রবাবের সুর শোনা যায় তার ভেতর থেকে। যেমনটি সহস্র এক আরব্য রজনীর কিস্যায়।

জোবেদান বলে - রাতের পর রাত গল্প শুনে যাওয়া বাদশা—রবাব বাজে দূরে, আঙুর ক্ষেতে, খেজুর বাগানে জ্যোৎস্না পড়ে থাকে। তাঁবুর বাইরে ধু ধু মরুবালির ওপর জেগে থাকে একটি উট। বসে বসে আকাশের দিকে মুখ তুলে খেজুর পাতা চিবোয়। আসমানে ভাঙা চাঁদ জেগে থাকে।

শাহজাদি গল্প বলে। জোবেদান বলে যায়।

সিন্দুক কথা বলে।

ও এচুপ, ভয় পেলি বাপ ! ইস্কুলি না যেতে চেয়ে কতদিন নুকুলি আমার আড়ালে। এখন বাড়ি লুটপাট করতে এলি, সোজা ডালা খুলি দেবা।

আমার দাদি ?

তারেও বলবা। আমি তো আছি। দরকার হলি ডানা নেড়ি নেড়ি উড়ি যাব। হুই আসমানে। হুই—সেই সেদিন রাতে যেমন—

ইউসুফ এবার যেন খানিকটা ভরসা পায়। যাক, তাহলে আমি আর দাদি একা একা নই। আমাদের সঙ্গে সিন্দুকদাদা, যে ইচ্ছে করলি ডানা নেড়ে—তখনই আবারও নিজের স্বপ্নকে একবার মনে পড়ে ইউসুফের। সিন্দুকের গা থেকে আবারও বাজনার ফিকে শব্দ শুনতে পায় ইউসুফ। সত্যি সত্যি সিন্দুকের ডালা খুলে যায়। বন্ধ হয়। আবার খোলে। ইউসুফ তাকিয়ে থাকে।

আর তখনই আবারও গোইলে হামলে ওঠে গোরু।

জোবেদান ছুট লাগায় গোইলের দিকে।

ইউসুফ জানতে চায়—সিন্দুকদাদা, তোমারও কাঁধে কি দুই ফেরেশতা—কেরামিন আর কাতেমিন

সিন্দুক কোনো জবাব দেয় না।

ইউসুফ আবারও একই প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়।

জবাব নেই।

সিন্দুকের ডালাও আর খোলে না। বন্ধ হয় না।

গোইলে গোবুর সামনে খড়কুচো দিতে দেতে জোবেদান আকাশের দিকে তাকায়। গোটা পাড়া এখনও সুনসান। রাস্তায় তেমন যাওয়া-আসা নেই। দূরে দিঘির গভীর থেকে একটি পুরনো ঘেটো রুই ঘাই দিয়ে আকাশের আলো কিংবা ওপরের খানিকটা বাতাস নিজের ভেতরে নিতে চায়। তার সেই চাওয়াটুকুর সঙ্গে সঙ্গে 'ঝপ' করে একটা আবছা শব্দ জলতল থেকে উঠে এসে চারপাশের হাওয়াব মধ্যে বসে যায়। জোবেদান সেই শব্দ শুনতে পায় না।

হায় আল্লা. কবে এই পেরেশানির দিন শেষ হবে! আবারও রাস্তায় হলুদ শাড়িপরা চুড়িওয়ালি ডেকে উঠবে! তার কাছে কাচের নতুন নতুন চুড়ি, কি তার রঙ! আর সেই সাজিমাটিঅলা, কেরোসিন তেল দেয়া হিন্দুস্থানী ছেলেটি! জোবেদানবিবি সব নিজের মনে পর পর জুড়তে থাকে।

আমার কাপড়ে ঘামেব গন্ধ, সাজিমাটিঅলা আসে না। কেরোসিন না এলে বাতি জ্বালাব কি দিয়ে? সবই মনে মনে জুড়ে নিতে চাইছিল জোবেদান।

ঠিক তখনই বড় ঘর থেকে সিন্দুকের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে নিজেদের উঠোনে দাঁড়িয়ে ইউসুফ রবে মুচি, মায়া মুচিদের বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। কাউকে দেখা যায় না। পৌষিকেও না। পর পর ইস্কুলে যাওয়া হলো না কদিন। সন্ধ্যার সঙ্গেও দেখা নেই। পদ্মরাজদের মেয়ে সন্ধ্যা। তার ঘটের মতো গোলগাল চেহারা। সন্ধ্যার শাদা দাঁতে শাদা আইসক্রিম লেগে থাকলে— ছবিটা ঠিক মতো বসাতে চাইছিল ইউসুফ।

রবে-মায়া—ওরা কি আমাদের বাড়ি লুটপাট চালাবে! ওরা কি মুসলমানদের ঘেন্না করে—ইউসুফ দূরে—সেই দিঘির জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পৌষি কেখোঁজার চেষ্টা করছিল। তার নোলকপরা নাক, গোল শ্যামলা-মুখ - সব! দিঘির পাড়ে গোটাচারেক তালগাছ, তাদের ছায়া ভেসে আছে জলে। খালি রবে মুচির মেয়ে পৌষি নেই।

আকাশে চিল চক্কর দিচ্ছে। প্রাচীন ঘেটো রুইটি জলতল থেকে ঘাই দিল। এবারও সেই জল নড়ে ওঠা দেখতে পেল না কেউ।

জোবেদান নিচু হয়ে উঠোনে কি একটা করতে চাইছিল। আর তখনই মোতালেবের জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল ইউসুফের। একদিন দেখা না হলেই এমন হয়। ইউসুফ আবারও দিঘির দিকে তাকাল।

বারো

বর্ডার পেরিয়ে 'রিফিউজি' বলে পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল মিজান আলি সর্দার আর শোভান আলি গাজি। বর্ডারে ইণ্ডিয়ান মিলিটারি আর ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে কিছু কিছু করে টাকা দিতে তবে চেক পোস্ট পার হওয়ার ব্যবস্থা। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর কাছে 'আমরা মুসলমান'-এ কথা বলেও বিনা পয়সায় হলো না।

প্রথমেই মনটা দমে গেল মিজান আলি সর্দারের।

বর্ডার পেরিয়ে মুসলমান রাজত্বে, ইসলামি আইনকানুনে খানিকটা স্বস্তি পাবে ভেবেছিল মিজান। এসে দেখল ছবি অন্যরকম।

খুলনা থেকে স্টিমারে ঢাকা যাওয়া যায়। স্টিমারে ঢাকা পেঁছে শোভানের চেনাজানা একজনের ফুপির ছেলে এক উকিলবাবুর বাড়ি তারা

দুজন উঠল। পার্ক সার্কাস, চিৎপুর, মেটিয়াবুরুজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া থেকে বহু মুসলমান ইস্ট পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে, বর্ডার পেরিয়ে—নিজের কওমের কাছে যাচ্ছি—এমন বিশ্বাস নিয়ে। তো সেই উকিলবাবুর বাড়ি দিন দুই।

প্রথমে তো হিন্দুস্থানের মুসলমান। তার ওপর সঙ্গে তেমন পয়সা-কড়ি নেই। প্রায় এক কাপড়ে চলে আসা।

মিজানের শোনা ছিল দুনিয়ার সব মুসলমান সমস্ত মুসলমানের ভাই। আরবে সবাই দরজা খুলে শোয়। সেখানে চোর নেই। থাকলেও ইসলামি কানুনে তার শাস্তি বড্ড কড়া। হাত কেটে নেয়া—চুরির শাস্তি। ব্যাভিচার করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরে ফেলা—এই না হলে সুবিচার!

পূর্ব পাকিস্তানে এসে এসব কিছুই মেলাতে পারছিল না মিজান, শোভান। নিজে মুসলমান হলে কি হবে, বাঙালি উকিলবাবু ওপার থেকে উড়ে এসে ঘাড়ে বসে হারামে খাওয়া 'বাঙাল' পাবলিককে রাখতে চাইলেন না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উকিলবাবুটি বলতে চাইছিলেন, ইন্ডিয়ায় তো গোলমাল কমে গেছে। তোমার এবার পথ দ্যাখো। দেশে ফিরে যাও। এখন তো আর ভিসা পাশ-পোর্ট নেই।

উকিলবাবুটির ঘরের দেয়ালে কাচ বাঁধানো রঙিন ফোটোগ্রাফে কায়েদ-এ-আজম জিন্না, ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান। আয়ুবের ছাঁটা চুলে, গোঁফে, পুরুষ্টু গর্দানে, বড় মুখে সকালের রোদ।

সেদিকে তাকিয়ে ক্লান্ত মিজানের হাই উঠছিল। ইসলামি রাষ্ট্র, তবু দেয়ালে ছবি! নিজেকেই নিজে জিগ্যেস করছিল মিজান, হাইয়ের ভেতর। তারপর ডান হাতের চেটোর উল্টো পিঠে নতুন হাই সামলে এটা কোনো বে-তমিজি হলো কিনা ভেবে নিতে নিতে মিজান আমতা আমতা করে বলতে চাইছিল, মানে ব্যাওসা ট্যাওসা—নুন, সুপুরি—কত রকম তো হয়—মিজান আলি জানতে চাইছিল।

সে হয় হয়ত, আনপড় লোকেরা করে। আমার জানা নেই। উকিলবাবুর গলায় খানিকটা তেতো ঝাঁঝ।

উকিলবাবুটির বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। মাথা ভর্তি চকচকে চুল টেনে পেছন দিকে আঁচড়ানো। পরিপাটি সরু সিঁথে দাড়ি-গোঁফ কামানো গোল

মুখ। এই শীতের সকালে তার পরনে কালো কোট। কালো প্যান্ট— সবই গরম কাপড়ের। একেবারে নিভাঁজ স্যুট।

তাঁর সামনে ইন্ডিয়া থেকে আসা দু জন 'বাঙাল মুসলমান'। যারা হিন্দুস্থান থেকে খেদা খেয়ে এপারে, কিছু ব্যবসাপাতির আশায়।

ডান হাতের আঙুলে মাথা চুলকোচ্ছে মিজান আলি। আসলে এ দেশটা মুসলমানের। ও দেশটা হিন্দুর। আমারা আর কাফেরদের দেশে ফিরতে চাই না। মিজানের গলায় কান্না ফুটে উঠছিল।

খুব ধীরে মাথা নাড়ছিলেন উকিলবাবুটি। তাঁর পাট পাট করা চুল থেকে বিদেশি কোনো ক্রিমের মিষ্টি গন্ধ উড়ে আসছিল। কাচ ঢাকা বড় টেবিলের ওপর একটি উর্দু কাগজ, বাংলায় 'ইত্তেফাক'। ওপার থেকে আসা 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'বসুমতী'।

কালির পেনে কাচের একপাশে রাখা ব্লটিং পেপারে আলগা করে দাগ দিতে দিতে উকিলবাবুটি বলছিলেন, এই তো, আপনাদের ইন্ডিয়ার কাগজে দিচ্ছে, সব ঠিক হয়ে আসছে। কার্ফু উঠে যাবে। জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র সেন—সবাই খুব চেষ্টা করছে আফটার অল ইন্ডিয়ার একটা সেকুলার ক্যামোফ্লেজ তো আছে সে যাক গিয়া—

ওদেশে আমরা আর ঝাব না—এখানেই কিছু একটা—নুন, সুপুরি— ঝা হোক কিছু

কথায় কথায় টেবিলে রাখা টিন থেকে ক্যাপসটেন সিগারেট তুলে নিলেন উকিলবাবুটি। তারপর লাইটারে ভালো করে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, সে আপনারা এখানকার মসজিদের এতিম-মুসাফিরখানায় কয়েকদিন থেকে যান। একটা নতুন দেশে এসেছেন, দেশটাও দেখুন কিন্তু এখানে ব্যবসা-ট্যবসা সে আমি কইতে পারি না। বলতে বলতে ক্যাপসটেনে একটা লম্বা টান দিলেন উকিলবাবু। ঘরের বাতাসে ধোঁয়া ঝুলতে থাকল।

মিজান শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে বলল, আপনিও মুসলমান, আমরাও মুসলমান। একটু দেখুন ভাই।

পেতলের দামি অ্যাশপটে সিগারেটের মুখে জমা ছাই নামিয়ে দিতে দিতে উকিলবাবুটি মাথা নাড়লেন, ধীরে—আপনারা মসজিদের এতিমখানায় থাকুন না কয়েকটা দিন, তারপর চলে যাবেন। নয়ত ব্যবসা করবেন সুযোগ পেলে—

বাকিটা আমি কিছুই কইতে পারি না। বাঁ হাতের কবজিতে সময় দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, আমার আবার বাইরানো আছে—

উঠে যাওয়ার সময় উকিলবাবুর ফিতে বাঁধা কালো গ্লেজ কিড বুটে মস মস শব্দ উঠছিল। এক খাবলা রোদ এসে পড়েছিল কায়েদ-ই-আজম আর ফিল্ড মার্শালের ছবির কাচে। মন খারাপ হয়ে গেল মিজানের। শোভানের।

একটু গিয়েই কি ভেবে আবারও জুতোয় শব্দ তুলে ফিরে এলেন উকিল-বাবুটি। টেবিল থেকে সিগারেটের টিনটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, এই দ্যাখেন না, দেখাইতেছি আপনেগো—আপনেগো কইলকাতার কাগজে ল্যাখছে—সব নর্মাল। যাগো ঘর পুড়ছে, সম্পত্তি নষ্ট হইছে—তাদের সবাইকে ক্ষতি-পূরণ দেবে ইন্ডিয়া গভমেন্ট—এই দেখুন না কাগজে বলেছে! ভয় কি আপনাদের! বলতে বলতে 'যুগান্তর'-এর প্রথম পাতাটি সামনে মেলে ধরলেন মিজানের সামনে।

দিন দুয়েক বাসি ইন্ডিয়ার বাংলা কাগজ দেখতে দেখতে মিজান শোভান কেউ-ই বলতে পারল না, আমরা আর হিন্দুর দেশে…

উকিলবাবু উঠে চলে যাওয়ার পরও তাঁর শূন্য চেয়ার, কাচ বসানো বড় টেবিল, টেবিল ল্যাম্প, সারাটা দেয়াল জুড়েই প্রায় কাচ-কাঠের আলমারির ভেতর চামড়া বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা মোটা মোটা আইনি কেতাব—দেয়ালে মহম্মদ আলি জিন্না আর ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান শোভান মিজানকে দেখতে দেখতে একসঙ্গে হা-হা, হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতেই থাকল। সেই হাসি একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে গেল। সঙ্গে ক্যাপসটেন সিগারেটের কড়া গন্ধ, চুল কালো আর পাট করার বিদেশি ক্রিমের ফিকে ঘ্রাণ—সব কেমন যেন জড়িয়ে মড়িয়ে গেল মিজান শোভানের সামনে।

'বলাকা' আর 'গুলিস্তান—দুটো সিনেমা হলে বাংলা সিনেমা চলছিল। বিকেলের শো-তে 'খানদান' দেখল মিজান আলি সর্দার আর শোভান আলি গাজি।

টাকা ভাঙাতে গিয়ে আগেই বুঝেছিল ইন্ডিয়ার থেকে এ দেশে টাকার দাম কম। ইন্ডিয়ার এক টাকা এখানে প্রায় দু টাকা।

দেখলে রেজ্জাকটা কেমন এসে দাঁড়িয়ে গেল এখানে—আমাদের ওখানকার ছেলে। টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ঘুরে ঘুরে পায়ের খিল খুলে গেচে। তবু কাজ পায় নি। ওখানে উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, অসিতবরণ, অনিল চ্যাটার্জি, বসন্ত চৌধুরি। মুসলমান রেজ্জাকদের কে পাত্তা দেবে! বলতে বলতে খোলা ভেঙে চিনে বাদাম মুখে ফেলল শোভান। মুসলমানের দেশ কিনা—কদর বুঝল—এখানে রেজ্জাক তো হিরো। তার কত বই—কত টাকা রোজগার। আহা, যদি একবার রেজ্জাকরে চোকির দেকা দেকতাম।

—মিজান আলি সর্দার মনে মনে বলছিল। কিন্তু আমাদের ব্যাওসা—সুপুরি, নুন নয়ত গোরু—এপার ওপার করি, অনেক টাকা—ভাজা বাদাম চিবোতে চিবোতে মিজান আলি সর্দার অনেক অনেক টাকার স্বপ্ন দেখছিল।

'খানদান' হিন্দিতে হয়েছিল না, ইন্ডিয়ায়? বাদাম ভেঙে আবারও মুখে দিতে দিতে জানতে চাইল মিজান।

এখানে আবার তুলেচে—শোভান জবাব দিল। বাংলায়। এটা এখেনকার—পূর্ব পাকিস্তানের সিনেমা।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে শোভান বলল, এই শালার উকিলের বাড়ি বেশিদিন থাকা যাবে না। কিছু একটা করতে হবে। বাঙাল মুসলমানরা দু চোক্ষে দেখতে পারে না আমাদের। ওদের অর্ধেক কতাও বুঝি না।

ঢাকা শহরের তখন শীতের একটি সন্ধ্যা নেমে আসছিল।

বাশার মা! ও বাশার মা! ইউসুফ কতদিন পর এই বাড়ির সামনে এসে ডাক দিচ্ছিল। শীতে ঘাস শুকিয়েছে। গাছেরা কেউ কেউ বুড়ো পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হতে চাইছিল। সবুজে কেমন যেন ধূসরতা।

হয়ত দিন দশ-বারো পর বুড়ির খবর নিতে এসেছে ইউসুফ। তার খবর নেয়া হয়নি এই ডামাডোলে। খাবার পাঠানো হয় নি—কে পাঠাবে! দাদি আজ আমায় মনে করিয়ে দিল। তাই তো আসা।

বাতাসে কি একটা পচা চামসানি গন্ধ ভাসছিল। গা গুলিয়ে ওঠে। পিচ কেটে থুথু ফেলল ইউসুফ। ভাগাড়ের গোরু পচা গন্ধ আসছে

কোত্থেকে! এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল ইউসুফ। তারপর—বাশার মা! বাশার মা! ও, বাশার মা—বলে বার তিনেক ডেকে সাড়া না পেয়ে—খানিকটা ভয় পাওয়া ইউসুফ সেই জঙ্গল, ঝোপঝাড়, একপাশে হেলে যাওয়া ঘরকে পেছনে ফেলে চলে আসতে চায়।

তারপর কি এক ঘোরের ভেতর দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে—যা সে আগে কখনই করেনি—প্রতিবারই বুড়ি সাড়া দেয়—খাবার নিতে বেরিয়ে এসে—কে, আমার গওহরের নাতি—আহা! আমার চুলির সমান হায়াৎ হোক—বলে পাকা মাথাটি নিয়ে সামনে দাঁড়াবে। হাতে লাঠি—আজ তো এলো না বুড়ি!

কেন—এমন ভাবনার ভেতর বুড়ির ঘরে ধীর পায়ে ঢুকেই চাপা গলায় 'ইয়া আল্লা' বলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে ইউসুফ। একটু ভেতরে অন্ধকারে—যদিও খড়, ভাঙা টিন, কাঠিকুটি, ছেঁড়া বিছন ছাওয়া চাল দিয়ে যে সামান্য রোদ, তাতে দেখা যায় এই পর্যন্তই—মেঝেয় চিৎ হয়ে বাশার মা। পাকা চুল খুলে যেন বা প্রেতিনী। চোখ, গালের মাংস, বুকের খানিকটা খোবলানো—হয়ত শ্যালে নিয়েছে।

এ বনে শেয়ালে আছে অনেক। ভাবতে ভাবতে ইউসুফের হাতের লাঠিটা ছিটকে একটু দূরে। ঘর জুড়ে গো-ভাগাড়ের গন্ধ। পচা গ্যাস। ইউসুফের পেট অব্দি গুলিয়ে উঠেছিল। মাটির ঠান্ডা মেঝে থেকে শরীর ফুঁড়ে উঠে আসছিল।

শেয়ালে, নাকি জেন-এ! ইউসুফের মাথার ভেতর প্রশ্ন উঁকি দিল।

বুড়ির তো দু-দুটো পোষা জেন। লোকে বলে। তাহলে কি জেন-এ! ইউসুফের সামনে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আমি তো কতদিন বাশার মা-কে ভাত দিয়ে যাই নি। আজ কতদিন হলো ঠিক মতো চুলো জ্বলে নি আমাদের। দাদির মন খারাপ। ভয়। এদিক-ওদিক যেতে চায় না। কাঠপালা কাটতে, ভাঙতে চায় না। খালি বসে থাকে। গা ধোয়। কাঁদে। কোরাণ পড়ে। হায় আল্লা, হায় খোদা—হায় মালিক বলতে বলতে দাদি খালি ফোঁপায়। এর মধ্যে কে কার খবর নেবে! আমরা পান্তা খাই। বেল পোড়া। মুড়ি।

আতঙ্ক—পচা দুর্গন্ধ তাড়া করছিল ইউসুফকে। ইউসুফ ছুটছিল। সেই কাঁচা ঘরের ভেতর না খেতে পেয়ে, পানি না পেয়ে ভাত না পেয়ে মরে

যাওয়া বাশার মা। তার মুখ, বুক শেয়ালে খেয়েছে। নাকি জেন-এ, হয়ত বাশার মায়েরই পোষা দুই জিন, ভাগাভাগি করে, খেয়েছে তাদের মালকিনের মাংস, পরম আনন্দে—

ইউসুফ বার বার ছবিটা দেখতে পাচ্ছিল চোখের সামনে। তার পায়ের নিচে রাস্তা সরে যাচ্ছিল। —দাদি, বাশার মা-কে শেয়ালে খেয়েছে, বাশার মা-কে শেয়ালে খেয়েছে, বাশার মা-কে জেনে খেয়েছে—বলতে বলতে ছুটে যাচ্ছিল সে। মুখে ফেকো উঠে আসছে। বুক বুঝি ভেঙে যাবে।

ঠিক তখনই তাদের সামনের রাস্তা দিয়ে চোঙা ফুঁকতে ফুঁকতে যাচ্ছিল দুজন সরকারি লোক। তাদের একজনকে চেনে ইউসুফ। কার্তিক চৌকিদার। যা-হা-দে-র ঘ-র-পু-ড়ে-ছে—স-ম্প ত্তি-র ক্ষ-তি হ-ই-য়া-ছে — উ-পযু-ক্ত প্র-মা-ণ- দে-খা-ই-লে ক্ষতি-পূরণ পা-ই-বে-ন— ক্ষ-তি-পূ-র-ণ পা-ও-য়া-র জা-য়-গা ।

যা-দে-র- ঘ-র পু-ড়ে-ছে—উপযুক্ত প্র-মা-ণ ·।

ইউসুফ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার পায়ের একটু দূরে তখন শীতের রোদ। আর সেই রোদ্দুর মেখে নিচ্ছে দুটি শালিক। বাতাসে শীত মিশে যাচ্ছে।

কেরামিন আর কাতেমিন— দুই ফেরেশতা বহুদিন পর বুঝি বা তার দুই কাঁধে ডানা স্থির করে বসল। নাকি উড়ে গেল—সে তো ইউসুফই জানে। আর জানে দুই ফেরেশতা।

— — —